সুভাষ সমাজদার

দাসদাসীর হাট

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রিয় বন্ধু
শঙ্কু মহারাজকে

দাসদাসীর হাট

এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন—"বিবর্তনবাদ অনুসারে পশু ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার অধ্যবসায় সহকারে ও বহু পরিশ্রমে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া মনোরম কাহিনীর আকারে ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িলে মনে হয় যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আঠারো শত বছর পরেও এই উর্দ্ধগতি সম্পূর্ণ হয় নাই। মনুষ্যের আকৃতি লাভ করিলেও অনেক স্থলে তাহার মধ্যে পশুর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই।"

এই লেখকের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ :

কোরিয়ার গণযুদ্ধ

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে।

কিন্তু তখনো গাছে গাছে অন্ধকার ঝুলছে বাদুড়ের মত। সেই ঝুকঝুকি আঁধারে নিজের হাতটাও ভাল করে দেখা যায় না। ঠিক সেই সময়—

সেই সময় লম্বা ব্যারাকের মত ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এল কতগুলো ছায়াশরীর। ওরা ফিসফাস করে কথা বলছে। খুক খুক করে হাসছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ।

ওদের দীঘল দেহে অটুট স্বাস্থ্য। বিশ বাইশ বছরের উথালপাথাল যৌবন। ওদের কারো গায়ের রঙ ফর্সা। কেউ বা ঘোর কালো। কেউ পাতলা ছিপছিপে আবার কেউ বা একটু দোহারা। কারো পরনে শাড়ি। কারো স্কার্ট। কিন্তু একটি—একটি ক্ষেত্রে মিল আছে ওদের।

ওরা প্রত্যেকে যুবতী!

হোক যুবতী, হোক বেশ শক্তসমর্থ। তবুও দেখা দরকার। দেখা দরকার ওদের চুল ঠিক আছে কি না; দাঁতগুলো ঠিক ঠিক আছে কি না। ভেতরে ভেতরে শরীর খারাপ করছে কি না। তাই—

খুট্—একটা শব্দ হলো। ব্যারাকের পাশে একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ো। হাতে একটা লম্বা লালরঙের খেরো বাঁধা খাতা। তাকে দেখা মাত্র মেয়েদের ভেতরে খুক খুক চাপা হাসির রোল পড়ে গেল আর শোনা গেল তাদের ফিস ফিস কথা—খাজাঞ্চি বুড়ো আসছে রে—খাজাঞ্চি বুড়ো আসছে—সব লাইন বেঁধে দাঁড়া—

ওরা সারি বেঁধে দাঁড়ালো। খাজাঞ্চি সাহেব হাঁক দিল, মেরী, নসীবন, দালিয়া, রোজী, ডায়না—সবাই এসেছো তো?

খাতা দেখে মিলিয়ে নাও না কেন খাজাঞ্চি সাহেব, হাসতে হাসতে তাদের ভেতরে একজন বলল।

নসীবন এদিকে এস—

ধীর পায়ে নসীবন এগিয়ে এল।

ক্ষীণ আলোয় যেমন পুঁথি পড়ে তেমনি করে তার মুখের দিকে তাকালো বুড়া। বলল, হুঁ, চোখমুখ একট বসা বসা দেখছি। রাত্রে ঘুমাও নি?

নসীবন মাথা ঝাঁকালো।

এই নগেন—ওর ওজনটা একবার নে তো—

নিজের মনেই আবার বিড় বিড় করে বলল, ওজন কমে গেলে আবার সাহেব বকাবকি শুরু করবে—

মেরী—দেখি তোমার দাঁতগুলো—

মেরী হাঁ করে দাঁত মেলে ধরল। বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, সে কী! তোমার দাঁতে লাল লাল ছোপ কেন? কে তোমাকে পান খেতে দিল—

মেরী কোন কথা বলে না। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। বুড়োর গায়ে কে যেন বিছুটির পাতা ঘসে দিয়েছে। লাফালাফি আর চিৎকার করতে শুরু করল। দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, জানো, সাহেবের কাছে আমাকে কথা শুনতে হবে—একটু থেমে বিড়বিড় করে বলল, দাঁড়াও তোমাদের মজা দেখাচ্ছি, —বুড়োর হাতের শঙ্কর মাছের চামড়ার চাবুকটা লিক লিক করে উঠল। সে মেরীকে ছেড়ে পর পর আরও যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ তাদের একজনের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বুড়োর কুঞ্চিত চোখে স্নিগ্ধ হাসির আলো ফুটে উঠল। নরম গলায় বলল, কেমন আছো দালিয়া—

দালিয়া কোন কথা বলল না। তার মেঘ ভাঙা জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা মাখানো সুডৌল মুখখানায় বিষাদের ছায়া নেমে এল। চোখের সামনে ভেসে উঠল গত রাত্রির সেই বীভৎস আর দুঃসহ স্মৃতি। এই বুড়ো সারারাত তাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে। কখনো বুকের ভেতরে জাপটে ধরে ময়দার তালের মত চটকেছে; কখনো—

দালিয়া—আবার মিষ্টি গলায় ডাক দিয়ে তার হাতটা ধরে আকর্ষণ করল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে ফিসফিস করে বলল, আজ একজন খদ্দের আসবে—তুমি যেন হুট করে বেরিয়ে এস না কেমন!

বুড়োর সোহাগ একেবারে উথলে উঠছে, মেয়েদের ভেতরে কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল। কথাটা খাজাঞ্চির কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল তার দিকে। আর বাতাসে লিকলিক করে উঠল সেই চাবুক।

সপাং—সপাং—সপাং—হতভাগিনীর পিঠ কেটে দরদর করে রক্ত ঝরল। আর যন্ত্রণায় একটা পশুর মত আর্তনাদ করতে লাগল।

দিন কাটে।

সেকালের কলকাতার বিভিন্ন স্লেভ গোডাউনের হতভাগ্য দাসদাসীদের জীবন এমনি দুরবস্থার ভেতরেই কাটতো। সারাদিন জন্তুর মত খাটতো। একটু এদিক সেদিক হলেই চাবুক। আর রাত্রে তরুণী মেয়েগুলোকে নিয়ে গোডাউনের বাবুদের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ে যেত! একটানা এই নিষ্পেষনের জীবন থেকে কবে মুক্তি পাবে সেই আশায় দিন গুনতো—

বেনিয়াটোলার দাসদাসীর কাছারীতে সেই দিন এল এক সম্ভ্রান্ত মোগল মহিলা, বাউলজী। পরনে জরিবসানো জামদানী শাড়ি। দাসদাসীদের ভেতরে সোরগোল পড়ে গেল। এই কাছারীর একটানা যন্ত্রণার কারাগার থেকে ওরা পালিয়ে বাঁচতে চাইতো। তাই সম্ভ্রান্ত এবং ধনী কোন খরিদ্দার এলেই ওরা সকলে একসঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এসে সারি দিয়ে দাঁড়াতো। আর তাদের অসহায় চোখের দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় বলতো—আমাকে অনুগ্রহ করে নাও—পেটভরে দুটো খেতে দিও আর একটু ভাল ব্যবহার করো—

তাই বন্যার জলের মত হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের সঙ্গে দালিয়াও বেরিয়ে এল।

দালিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণী মেয়ে। প্রথম সূর্যের আলোয় যেমন পদ্মকোরকের পাঁপড়ি একটু একটু করে নিজেদের মেলে ধরে তেমনি দালিয়ার ভেতরেও যৌবনের পাঁপড়ি ফুটি ফুটি করছিল।

এক নজরেই ভাললাগার মত। বাউলজীর লেগেওছিল ভাল তাই। খাজাঞ্চিকে বলেছিল—কত দাম?

ওর দাম অনেক। আরও তো অনেক আছে নিন না? দালিয়াকে বিক্রি করতে খুব ইচ্ছে ছিলনা বলেই একটা চড়া দাম বলেছিল।

জুলাই। নসীবন। মেরী। এই তিনটি মেয়েকে দেখতে অনুরোধ করল খাজাঞ্চি।

এই যে দেখুন, এই মেয়েটির নাম মেরী। কাফ্রী মেয়ে। দেখেছেন স্বাস্থ্য। মাত্র বাইশ বছর বয়স। রান্নাবান্না এবং ঘরের যাবতীয় কাজ জানে। দাম বেশি নয়—মাত্র ত্রিশ টাকা—

আর ওই মেয়েটি?

ওর নাম নবীবন—পাবনার এক বাজারে ওর মা অভাবের দায়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল আমাদের দালালের কাছে। ওকে পুরোপুরি আপনি গভর্নেসের কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—

না খাজাঞ্চি সাহেব আমি নিলে দালিয়াকেই নেব। যত টাকা লাগে লাগুক—বাউলজীর কণ্ঠস্বর খুব কঠোর মনে হলো।

খাজাঞ্চির মুখে অন্ধকার নেমে এল।

দালিয়ার দিকে একবার হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালো খাজাঞ্চি। ভাবলো কত বলেছি। খরিদ্দার কেউ এলে আগেই বেরিয়ে এস না। ওই আগুনের মত রূপ দেখলেই ভাল লাগবে জানা কথা। বাউলজীর পায়ের শব্দ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে বিপদ বাধালো।

আপনার মন খারাপ হচ্ছে নাকি খাজাঞ্চি সাহেব? মুখ টিপে হাসল বাউলজী।

না না, ও তো বিক্রিরই মাল—হেঁ হেঁ—হাসতে চেষ্টা করল—হাসিটাকে মনে হল কুকুরের কান্নার মত।

নগদ পঞ্চাশ টাকা গুণে খাজাঞ্চির হাতে দিয়ে বাউলজী দালিয়াকে নিয়ে তার ঘোড়ার গাড়ীতে উঠল।

খাজাঞ্চি সাহেবের মাথায় যেন বাজ পড়েছে। তার মুখ কালো।

কিন্তু মেভদের গুদামে তখন চাপা হাসির রোল পড়ে গিয়েছে। টুকরো টুকরো কথাও শোনা যাচ্ছে—বুড়ো এবার রাত্রে কাকে নিয়ে থাকবে?

তোকে—আবার কাকে?

দুর মুখপুড়ী। ওর বিছানায় যেতেই বয়ে গিয়েছে—

ওদের কথা খাজাঞ্চির কানে এল। দালিয়াকে নিয়ে প্রেম ও নিশিযাপনের সেই মধুর স্মৃতি তার রক্তের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিল। একদিন নয়, দুই দিন নয়—পুরো এক বছরের শয্যাসঙ্গিনী। দালিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই পাশাপাশি আর একটা শান্ত নরম মুখচ্ছবি তার চোখে ভেসে উঠল। কোথায় কত দূরে নিবিড় মমতায় ভরা গৃহাঙ্গনে তার কথা ভেবে ভেবেই বিনিদ্র রাত্রির প্রহর পার করে আর একজন। তার কাছে একবার যেতেই ইচ্ছে করে না। আর ইচ্ছে করলেও যেতে পারে না। কাছারীর চাকরিতে ছুটি বড় কম—তাই বছরের পর বছর বিদেশে থাকতে হয়। কি করবে সে—কেমন করে বাঁচবে? সেও তো মানুষ। আকণ্ঠ তৃষ্ণা। তার চোখের সামনে সুস্বাদু জলের স্রোত

বয়ে চলেছে। সে একটু নেমে অঞ্জলি ভরে খেতে পাবে না। জীবন্ত মেয়ে পুরুষের কারবারী হয়ে বেশ ভালই আছে। কিন্তু এক এক সময় খুব মন খারাপ হয়। খারাপ হয় তখন যখন তার ওয়্যারহাউসের মেয়ে কি পুরুষ কোথাও কোন অত্যাচারী প্রভুর হাতে নির্যাতিত হয়। এক এক সময় মনে হয়, সে পাপ করছে—মহাপাপ! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনিয়াটোলা শ্লেভ ওয়্যারহাউসের ইনচার্জ নয়নারায়ণ চক্রবর্তী।

আর একটা নতুন জীবন শুরু হলো দালিয়ার।

একটা শ্বাসরোধী অন্ধকারের কারাগার থেকে অবারিত আকাশের নীচে অজস্র আলোর রাজ্যে এল সে। অগাধ বিত্তশালী ব্যবসায়ী আলম বাউলজীর ঘরে এল দালিয়া দাসী হয়ে।

শোন তোকে আমি কিনে এনেছি বটে, কিন্তু তুই কখনো দাসীর মত থাকিস না—তুই থাকবি আমারই ছোট বোনের মত, লেডী বাউলজীর কথাগুলো যেন গানের মত শোনাচ্ছিল।

তারপরেই দেরাজ খুলে জরির চুমকি বসানো মেঘডম্বুর শাড়ি বের করেছিল। বের করছিল গহনা। দালিয়াকে মনের মত করে সাজিয়েছিল। কিন্তু মেঘডম্বুর শাড়ি আর বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত মূর্তিমতী প্রতিমার মত সেই দালিয়ার দিকে তাকিয়েই বাউলজীর মনে অশুভ একটা আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল। দালিয়া তার চেয়েও অনেক-অনেক সুন্দরী! মনে হল, সেধে খাল কেটে বাড়ীতে কুমীর নিয়ে এল সে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝতে পারল বাউলজী, দালিয়া রূপসী হতে পারে কিন্তু তার খুব বাধ্য। এবং তার নিজের রূপ সম্বন্ধে এতটুকু সচেতন নয়। তাই বেশ নিশ্চিন্তই হয়ে গেল বাউলজী।

দিন কাটে। মাস যায়। বছর ঘুরে আসে। ক্রীতদাসী হলেও দালিয়া মেয়ে তো! তার মেয়েলী মন দিয়ে সব বুঝতে পারল—ধরে ফেলল মালিক আলমসাহেব আর বাউলজীর ভেতরে এতটুকু মিল নেই। দুজনেই হাসে। কথা বলে। কিন্তু তাদের ভেতরে দুস্তর ব্যবধান!

আলমসাহেব সারাদিন বাইরে কাছারী বাড়ীতেই পড়ে থাকে। মোসাহেবরা আসে। আসে বাইজী। আসে মদ। রাত্রির পর রাত্রি চলে মাইফেলী। কখনও কখনও শিকারেও যায়। শিকার, মেয়েমানুষ, মদ আর

খোদাহেব নিয়ে সে যে জগতে বাস করে—সে জগত বাউলজীর পৃথিবী থেকে অনেক—অনেক দূর!

আর বাউলজীর দুর্বলতাও ধরে ফেলল দালিয়া। হঠাৎ কোথা থেকে এক এক দিন হেসে হাজির হয় এক অপরূপ সুন্দর তরুণ। দীর্ঘ উন্নত চেহারা। মাথায় একরাশ ঘন কোঁকড়ানো চুল। পরণে খুব দামী পোষাক। ধানবাদের কোন একটা কয়লাখনির মালিকের একমাত্র ছেলে। সে এলেই বাউলজী একটা রঙ্গীন প্রজাপতির মত যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে হাঁটতো। বদলে যেত তার দুনিয়ার রঙ!

একদিন ফয়েজ খাঁ অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে চলে যাওয়ার পরে দালিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই ফয়েজ খাঁসাহেব তোমার কে হন মাইজী?

মাইজী কি রে—তোকে কতবার বলেছি দিদি বলবি—

আচ্ছা আচ্ছা তাই বলবো দিদি—

বাউলজী ফয়েজ খাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লজ্জায় আবির রাঙা হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে, জানিস, ফয়েজ হলো আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার বাপজানের দোস্তের ছেলে। তারপরে ফিস ফিস করে বলল, জানিস এই ফয়েজের সঙ্গেই আমার সাদীর সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু—

দুশ্চিন্তির ছায়া নেমে এল বাউলজীর চোখে। কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, মানুষ যা ভাবে, তা হয়না রে দালিয়া—আমার বাপজানের জন্য সব কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল বাউলজী। হয়তো ক্রীতদাসীকে এ সব কথা বলা উচিত নয় বলেই চুপ করে গেল। ধীর পায়ে মাথা নীচু করে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে সুরু করল।

একটা পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ক্রীতদাসী দালিয়া। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল এক অন্ধকারের রাজ্য থেকে আর এক অন্ধকারে এসে পড়েছে সে।

এই কো-ই হ্যায় হিঁয়া—দোতালা থেকে মালিক আলমসাহেব হাঁক দিচ্ছে—বাবুর্চি-বয় খানসামা কেউ নেই নাকি?

আস্তে আস্তে সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠল দালিয়া। সচরাচর সে যায় না তার যাওয়ার কথা নয়। সে মালিকানীর খাস বাঁদী। তবুও যিনি ডাকছে তিনিও তো মালিক।

কে তুমি? এক নজরে নেশারক্ত দুটো চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে চিনতে পারল না।

আমাকে চিনতে পারলেন না হুজুর—আমি দালিয়া।

ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেখ দেখি—চিনতেই পারিনি তোমাকে—

কোন কথা বলল না দালিয়া। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, সবুজ রঙের জাজিম বিছানো ফরাসে ছেঁড়া বেলফুলের মালা! মদের গেলাস এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। তবলা ডুগী হারমোনিয়মও আছে—কোনটা ওল্টানো—কোনটা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

কি দেখছো দালিয়া?

কেন ডেকেছেন বাবুজী—ফরমাইয়ে! মাথানীচু করল দালিয়া। মালিকের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না।

কোন কথা বলল না আলমসাহেব।

সে ডেকেছিল তার পাঠান খানসামা ধ্যানচাঁদকে। তাকে রণপায় করে এখুনি রওনা করিয়ে দিতে হবে মুর্শিদাবাদের পথে। সেই পথ দিয়েই পাখী অর্থাৎ সুন্দরী বাঈজী মেয়েটা পালিয়েছে। কিন্তু এসব কাজ তো এই মেয়েটিকে দিয়ে হবে না। তবুও সুন্দরী একটা তরুণী মেয়ে তার জলসাঘরে যখন এসেই পড়েছে! বলল, শোন—এদিকে এস—

দালিয়ার হঠাৎ মনে হল, একটা বিষধর সাপ যেন হিমশীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সারা শরীর শির শির করে উঠল। ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ।

আরে—আরে ভয় পাচ্ছো কেন? আমি কি বাঘ না ভালুক দালিয়া, বলতে বলতেই একেবারে তার কাছে চলে এল আলমসাহেব। দালিয়ার কবুতরের মত হাল্কা দেহটাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হয়েছিল আলমের। কিন্তু একটা কথা ভেবে তাকে স্পর্শ করল না। শুধু খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বলল, শোন দালিয়া, তোমার মালিকানীর ঘরে সেই শয়তানের বাচ্চাটা এসেছে?

কে বাবু?

ওই যে ফয়েজ খাঁ।

একটু আগে এসেছিলেন—এখন চলে গিয়েছেন!

হঁ—দাঁতে দাঁত চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। বলল, কতক্ষণ ছিল সেই শয়তানটা?

তা প্রায় ঘণ্টা তিনেক হবে—

দা-লি-য়া—বাউলজীর আর এক বাঁদী জুলিয়ার গলার স্বর শোনা গেল। নিশ্চয়ই মালিকানী ডাকছে বলেই জুলিয়া তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি যাই বাবুজী—বলেই হরিণীর মত দ্রুত পায়ে ওপরে চলে গেল দালিয়া।

তারপরে—

তারপর এক বিচিত্র নাটক সুরু হলো আলম সাহেবের বাড়ীতে।

সেই নাট্যপ্রবাহের খরস্রোতে কোথায় কুটোর মত ভেসে গেল দুর্ভাগিনী সেই দাসী। সেকালের যে কোন অপঘটনের বলি হতো তারা, যাদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। সেই সুদূর অতীতকালে ধান, চাল, দুধ, তরিতরকারী অসম্ভব সস্তা ছিল আর সেই সব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের চেয়েও বেশী সস্তা ছিল দাসদাসীদের জীবন।

দালিয়ার আগুনের মত রূপ আলমসাহেবের মনে নেশা ধরিয়ে দিল। তার জলসাঘরে নিত্যিনূতন বাঈজীর আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। নিশিরাতে গৃহস্থঘরের কোন সুন্দরী কুলকন্যাও আর আসে না।

ধনকুবের আলমসাহেব এক নূতন খেলায় মাতল। সন্ধ্যে হতে না হতে দামী বিলেতী মদের কয়েকটা বোতল এবং গ্লাস সাজিয়ে বসবে। ঢোকে ঢোকে মদ খেতে খেতে পাল্টে যাবে চোখের রঙ। সারাটা মুখ হয়ে উঠবে লাল গনগনে আগুনের মত। কানের পিঠদুটো থেকে আগুন ছুটবে। দেখতে দেখতে রাত বাড়বে। চাকর খানসামারা অবাক হবে, বাবুর একজনও ইয়ার মোসাহেব এল না দেখে। কিন্তু খাস খানসামা ধ্যানচাঁদ একটুও বিস্মিত হবে না, সে জানে—যখুনি দেউড়ীর পেটাঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজবে—তখুনি ডেকে নিয়ে আসতে হবে বেনিয়াটোলার কাছারী থেকে কেনা মালিকানীর ওই খাপসুরৎ বাঁদীকে! যে অবস্থায় থাক—তাকে বাবুর কাছে এনে দিতে হবে। দালিয়া তার ঘরে পা দেওয়ামাত্র দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপরে আর কি। দুটো বিপরীতধর্মী শব্দ শোনা যাবে। উল্লসিত হাসি আর একটা বুকচাপা করুণ কান্নার আওয়াজ। কিন্তু একটু পরেই সেই

গুমরানো কান্নার শব্দটা থেমে যাবে। পাথরের মত জমাট স্তব্ধতা নেমে আসবে জলসাঘরে।

তারপরে রাত যখন গভীর হবে তখন হতভাগীকে বের করে দেবে ঘর থেকে। আর চেনা যাবে না দালিয়াকে। খোলাচুল এলিয়ে পড়েছে পিঠময়। শিথিল বেশবাস। মরা একটা সাপের মত ঝুলছে শাড়ির আঁচল। তখনো উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছে! খুব-খুব ক্লান্ত দেহটাকে কোনরকমে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায় অন্দরমহলের দিকে।

রাত আটটা।

পেটাঘড়ির ধাতব শব্দটা বায়ুতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে যেই দালিয়ার কানে এসে পৌঁছায় অমনি তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। নিদারুন একটা যন্ত্রনায় চিন চিন করে জ্বলে যায় মনটা। কিন্তু কোন উপায় নেই—কোন প্রতিকার নেই—সে যে বেনিয়াটোলা কাছারী থেকে পঞ্চাশ টাকায় কেনা দাসী! এক একবার ভাবে মালিকানীকে বলে দেবে—বলে দেবে বাবুর কীর্ত্তিকলাপ! কিন্তু তাতে কি লাভ—ওদের মনকষাকষি আরও বাড়বে। তাই কিছুই বলতো না বাউলজীকে।

ওদিকে দালিয়ার সঙ্গে বাউলজী মেলামেশা করতো বন্ধুর মত। মাঝে মাঝে ভুলেই যেত যে দালিয়া তার দাসী।

দালিয়া প্রখর বুদ্ধিমতী।

তাই তার গোপন অভিসার, তার প্রণয়ীর সঙ্গে নৈশবিহার প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্কার্যের একমাত্র সাক্ষী এবং সঙ্গিনী ছিল দালিয়া। এই জন্যেই বাউলজী কখনো তার ওপরে প্রভুত্ব করতো না—করতে পারতো না।

কিন্তু বাউলজী দালিয়া নয়। বড় লোকের বৌ, বড় লোকের মেয়ে তার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারতো না। মুস্কিল হতো দালিয়ার।

নিশিরাত থম থম করছে।

যত দূর চোখ যায় থৈ থৈ করছে জ্যোৎস্না। গঙ্গার বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর দিয়ে সঞ্চারমান জেলেডিঙ্গি, গহনার নৌকো আর বয়াগুলোকে এক এক টুকরো অন্ধকারের মত মনে হচ্ছে।

তাদের ভেতরে একটি ময়ুরপঙ্খী বজরা ধীরগতিতে চাঁদপাল ঘাটের দিক থেকে শিবপুরের দিকে চলেছে। বজরার ছাদে গানের আসর বসেছে। মধুর

সুরে একটানা একতারা বেজে চলেছে। সেই সঙ্গে মিষ্টি সুরের একটি গান শোনা যাচ্ছে—

কি জানি কি করেছি
প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়েছি……

সেই গানের সুর জলরাশির ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূরে জ্যোৎস্না—ধোয়া কাজলকালো দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় চাঁদ পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়ল। গান শেষ হলো।

আচ্ছা ফয়েজসাহেব এই চাঁদনী রাত্রি যদি অফুরান হতো—

তাই মনে হয় বাউলজী। কিন্তু এই সুন্দর স্বপ্নের পৃথিবী থেকে আমাদের বাস্তবে ফিরে যেতে হবে, বলতে বলতে তার কাছে ঘন হয়ে বসল ফয়েজ।

দালিয়া বজরার হালের কাছে বসে এতক্ষণ বাউলজীর গান শুনছিল। ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতেই দালিয়া নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। সে জানে,—অনেক দিন ধরেই জানে এখন কি হবে। আরও—আরও ঘন হয়ে বসবে তারা। জ্যোৎস্নার রেখার মত দুটো ছায়াদেহ পরস্পর কণ্ঠলীন হয়ে কিছুক্ষণ টুকরো টুকরো কথা বলবে। সেই মধুর ছন্দোসুরভিত মুহূর্তগুলো শিশির বিন্দুর মত ঝরে ঝরে পড়বে গঙ্গার বুকে। তারপর—

তারপর—যা হয়। যা হয়ে থাকে। বিপুল এক সুখের অনুভবে একেবারে আবিষ্ট হয়ে যাবে এই জ্যোৎস্না ধোয়া রাত্রি আর সে—

সে একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মত তাদের এই বজরার রুদ্ধ দুয়ারের সামনে বসে থাকবে। থাকতে হবে—সে যে দাসী—স্লেভ! কিন্তু—

হোক—স্লেভ। তারও তো দেহের শিরায় শিরায় যৌবনের রক্ত উদ্দাম হয়ে বয়ে চলেছে। বন্ধ ঘরের সামনে নিঃশব্দে বসে থাকতে থাকতে তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম ঝিম করে!

কিন্তু এক চুল নড়ার উপায় নেই। কড়া হুকুম—যতক্ষণ ফয়েজ খাঁর সঙ্গে ঘরের ভেতরে থাকবো ততক্ষণ কোথাও যাওয়া হবে না—

তারপর যখন শেষ রাতের তরল অন্ধকার বাদুড়ের মত গাছে গাছে ঝুলতে থাকবে আর একটু একটু করে পূবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে উঠবে ঠিক সেই সময় উচ্ছৃঙ্খল নিশিযাপন করে বেরিয়ে আসবে মালিকানী বাউলজী। বড় বড় কালো দুটো চোখের নীচে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন আঁকা!

চল-চল শিগ্‌গির চল্ দালিয়া, ফরসা হওয়ার আগেই বাড়ীতে পৌঁছাতে

হবে—পাড়ে নেমে যে কোন একটা ঘোড়া গাড়ী ধরার জন্য ছুটোছুটি করতে থাকে। তারপর বাড়ীতে এসেই ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে তাকে কাছে ডাকে। বলে, জানিস দালিয়া, ফয়েজ খাঁ আমাকে খুব ভালবাসে—খুব—একটু থামে। আবার বলে, বুঝলি দালিয়া, আমার এক এক সময় বহুদিন বহুকাল বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে, বলতে বলতেই কেন যেন তার গলার স্বর খুব ভারী হয়ে উঠে। দুচোখে কান্না থমথম করে। আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বলে, কিন্তু দালিয়া আমার কেন যেন ভয় হয়—মনে হয়, হয়তো কোন বিপদ হবে—বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তার মনে হয় মালিকানীর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হতে চলেছে। এত ভয় আর আশঙ্কাই যদি থাকে তাহলে প্রেম করতে যাওয়া কেন? নিজের ঘরের পুরুষটাকেই বেঁধে রাখার চেষ্টা করে তাকেই কি ভালবাসা যায়না? কি জানি বাপু বড়লোকের খেয়াল।

এদিকে দিনে দিনে দালিয়ার ওপরে আলমসাহেবের আকর্ষণ বেড়েই চলে। এক একদিন তাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে আলমসাহেব বলে, তোমাকে সাদীই করে ফেলবো দালিয়া!

সাদী! ম্লান হাসি ফুটে ওঠে দুর্ভাগিনীর মুখে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। কিছুই বলে না—বলতে পারে না! কি-ই বা বলার থাকতে পারে। সে জানে বাবুরা নেশার ঝোঁকে ওরকম এক একটা বেতমিজ কথা বলে ফেলে। দাসীবাঁদীকে কথনো সাদী করে না—

তাই আলমসাহেবের ওসব কথায় আমল দেয় না। আর কেন যেন মালিক সাদীর কথা বললেই বাউলজীর হাসি হাসি মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয়, আহা! অমন ভাল মানুষ কিন্তু বড় দুঃখী! কিন্তু—

কিন্তু আলমসাহেবকে আমল না দিলে কি হবে? যে রাত্রে মালিকানী গোপন অভিসারে যেত ঠিক তার পরের দিন রাত আটটা ছাড়া দুপুরেও তার ডাক পড়তো।

যেই চারিদিক নির্জন হয়ে যাবে অমনি ধ্যানচাঁদ এসে হাজির হবে। বলবে—চল তোকে বাবু সেলাম দিয়েছে—

তার মন চায় না। বুকের ভেতরে তীব্র অস্বস্তির কাঁটা বিঁধতে থাকে। তবুও যেতে হয়—যেতেই হবে—দাসীর আবার স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য আছে নাকি?

বসো দালিয়া—কেমন আছো, অভিমানের স্বরে আলমসাহেব বলে, না ডাকলে তুমি আসো না কেন ? বলেই সাপের মত নিবিড় বাহুবন্ধনে বন্দী করে ফেলে তাকে। আলমসাহেবের দুই চোখে কামনার আগুন জলজল করে। তার কবল থেকে যত মুক্ত হতে চেষ্টা করে তত বেশী করে তাকে একেবারে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে। তার ইচ্ছে করে চিৎকার করে কাউকে ডাকে, ইচ্ছে করে নখ দিয়ে আলমসাহেবকে আঁচড়ে একেবারে রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

কিন্তু—

পারে না—পারা সম্ভবও নয়। তার কোন অনিচ্ছা বা বেয়াদপী অমার্জনীয় অপরাধ। তাই আলমসাহেবের কবলে ধরা দিতে হয়। একান্ত অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করতে হয়।

এইখানেই শেষ নয়।

তাকে নিয়ে লোফালুফি আর মত্ততা শেষ হওয়ার পর তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে তুলে ধরে সোফায় বসিয়ে দেয়। তারপর শুরু করে অত্যাচার। সেই অত্যাচার—বিচিত্র !

ঘরের এককোণে একটা বড় দেরাজ থেকে বের করে একটা ঝকঝকে ধারালো তলোয়ার। বলে—এইবার যে যে প্রশ্ন করবো তার একটার উত্তর না পেলে এক কোপে ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দেব—তারপরেই তলোয়ারের ডগা দিয়ে পিঠে আস্তে একটা খোঁচা মেরে বলে—বল কাল রাত্রে তোর মালিকানী কোথায় গিয়েছিল ?

গঙ্গায়।

গঙ্গায় কি—গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে, না নৌকো নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণ করতে ?

প্রমোদ ভ্রমণ করতে—

সঙ্গে কে ছিল ?

মাথা নীচু করে। কথা বলে না সে। সঙ্গে সঙ্গে ধারালো সেই তলোয়ারের ডগা লোলুপউল্লাসে তার উত্তুঙ্গ বুকের দিকে এগিয়ে আসে।

চুপ করে থাকিস না। বল—বল—না বললে এখুনি মরবি তুই, বলেই আবার একটা খোঁচা দেয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে সে। তার চিৎকার

শুনলেই মাথায় যেন খুন চেপে যায় আলমসাহেবের। তলোয়ার ফেলে দিয়ে বাঘের থাবার মত দুহাতে তার মুখটা চেপে ধরে।

বলছি—সব বলছি, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন, বলেই অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দালিয়া। কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট গলায় বলে—মালিকানীর সঙ্গে ফয়েজ খাঁ ছিল—

তারা কি করছিল?

গান বাজনা করছিল—

কত রাত পর্যন্ত?

মাঝ রাত অবধি।

তারপর?

আবার চুপ করে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল যন্ত্রের মত এগিয়ে আসে সেই তলোয়ার। কর্কশ গলায় বলে—চুপ করে থাকিস না মাগী, বল—বল—

তারপর ওরা দুজনে বজরার কুঠুরীতে যেয়ে খিল বন্ধ করেছিল।

তখন তুই কি করছিলি?

আমি সেই কুঠুরীর বাইরে পাহারায় থাকি—যেন কোন মাল্লারা সেদিকে না আসে।

কতক্ষণ পরে তারা বেরিয়েছিল? হিংস্র হয়ে ওঠে আলমসাহেবের মুখ।

শেষ রাতের দিকে—

এই কথাটা শুনেই হো হো করে হেসে ওঠে আলমসাহেব। হঠাৎ আলমারী থেকে একটা কাঁচের বয়ম বের করে নিয়ে আসে। বয়মের ভেতর থুক থুক করছে মাছি। ঢাকনা খুলে এক একটা মাছি বের করে দেওয়ালের গায়ে টিপে টিপে মেরে একটা বদ্ধ উন্মাদের মত হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলে—এইভাবে তোর মালিকানীকে—তোকে টিপে মেরে শেষ করে দেব—বলেই এক ধাক্কা মেরে ঘর থেকে দূর করে দেয়। প্রহৃত একটা জন্তুর মত বাইরে ছিটকে পড়ে খানিকক্ষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে দালিয়া।

কিন্তু বড়লোকের বাড়ীতে দাসদাসীদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, তাই তার আর্তনাদ শুনে কেউ এগিয়ে আসে না।

কিন্তু আলমসাহেব এবং বাউলজী—দুইজনেরই প্রিয়পাত্রী বলে অন্যান্য দাসীরা বিশেষ করে জুলিয়া দালিয়াকে হিংসে করতো। সে একদিন বাউলজীকে বলল। বলল, প্রতি সন্ধ্যায় মালিকের জলসা ঘরে দালিয়াকে

গোপন অভিসারের কথা, তার ওপর তীব্র আকর্ষণের কথা। সব বৃত্তান্ত শুনে বাউলজী বলল, দালিয়া দেখতে শুনতে ভাল—ওর ওপর নজর পড়তে পারে। কিন্তু আমাকে না বলে—

মালিকানী, আপনি দালিয়াকে এত বিশ্বাস করেন, হাসল জুলিয়া। ছুরির ফলার মত ধারালো হাসি। বাউলজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে ফিস ফিস করে বলল। শুধু আমি কেন নসীবন রাবেয়া আমরা অনেকে আড়ি পেতে শুনেছি, বাবু ওই রূপের ডালি বদমায়েস মাগীটাকে সাদী করতে পর্যন্ত—

কী!—সাদী! বিষধর সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল বাউলজীর লম্বা ছিপছিপে শরীরটা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, বেনিয়াটোলার দাসদাসীর কাছারী থেকে পঞ্চাশ টাকায় কেনা বাঁদী হবে আমার সতীন—আর কিছু বলল না। জুলিয়া দেখল ওষুধ ধরেছে, সে চলে গেল।

বাউলজী কিন্তু দালিয়াকে কিছু বলল না। তার সঙ্গে সামনাসামনি ঝগড়া করার উপায় নেই তার। সে গোপনে লক্ষ্য করল, দেউড়ীর ঘড়িতে রাত আটটা বাজলেই ধ্যানচাঁদ আসে। দালিয়াকে জলসাঘরে নিয়ে যায়! কিন্তু —দালিয়ার মুখ ম্লান কেন—কেন ওর মুখে ব্যাথার ছায়া থমথম করে। মালিকের কাছে আদর খেতে যাচ্ছে অথচ খোঁপাটা পর্যন্ত ভাল করে বাঁধেনি! পরনেও নিতান্ত একটা আটপৌরে শাড়ি! ব্যাপার কি! তাহলে কি অনিচ্ছা নিয়ে বাধ্য হয়ে পশুটার খপ্পরে যাচ্ছে? তাই যদি হবে—তাহলে তাকে কেন কিছু বলেনি! কানে বাজে জুলিয়ার কথাগুলো বাবু ওকে সাদী পর্যন্ত করতে চায়! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়, মেয়েরাই মেয়েদের বুঝতে পারে! দালিয়া শয়তানী—ও ভাব দেখাচ্ছে যেন বাধ্য হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওই কামার্ত পশুটার খোরাক হতে যাচ্ছে—

বাউলজী মনে মনে জ্বলে। কিন্তু দালিয়ার সঙ্গে হেসে কথা বলে। বুঝতে দেয় না। ওর সম্বন্ধে তার মনের আক্রোশ যেন দালিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কিন্তু আর কখনো গঙ্গায় ফয়েজ খাঁর সঙ্গে নৌকো বিহারের সময় দালিয়াকে সঙ্গে নেয় না! তীব্র আশঙ্কায় দালিয়ার বুক কাঁপে—তাহলে মালিকানী সব জানতে পেরেছে! কিন্তু খোলাখুলি কিছুই বলতে পারে না বাউলজীকে।

নিঃশব্দে যন্ত্রণায় পুড়ে যায় মনের ভেতরটা।

এইভাবেই বাউলজীর বাড়ীতে দাসী দালিয়ার জীবন কাটছিল।

একদিন—একদিন ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক অঘটন। শিয়ালদহ কোর্ট থেকে গড়াতে গড়াতে মামলা উঠল গিয়ে একেবারে সুপ্রীম কোর্টে।

১৭৮৫ সালের ১৩ই জানুয়ারীর বেঙ্গল ক্রনিক্যালে লেখা আছে This atrocious cruelty was perpetrated by Moghul lady named 'Bauljee'! The wife of a Moghul merchant of Calcutta কলকাতার এক মোগল সওদাগরের স্ত্রী এই নৃশংসতম ব্যবহার করেছিল। সেই পাতায় ছিল দুইটি মহিলার ছবি। একজন বর্ষিয়সী অভিজাত। কিন্তু তার চোখেমুখে কেমন একটা হিংস্রতার ছাপ। গোলাপী ডালিমের দানার মত হাল্কা নীচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছবির নীচে ক্যাপশান আছে, মোগল লেডী বাউলজী। তার পাশের ছবিটিতে আছে একটি অষ্টাদশী তরুণী। ছিন্ন বসন ; মলিন মুখ, গালের ঠেলে ওঠা দুটো হাড়ের ওপরে দু ফোঁটা অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করছে। প্রতিমার মত সুডৌল সুন্দর মুখশ্রীতে গভীর বিষাদের ছায়া। এই ছবির নীচে ক্যাপশন আছে, বাউলজীর দাসী, দালিয়া।

প্রতিকৃতি দুটোর পরেই ক্রনিক্যালের সম্পাদকীয়ের পাতায় ছাপা হয়েছে দীর্ঘ বিস্তারিত এক বিবরণ। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোনস তাঁর রায়ে বলেছেন, Dalia was the victim of the secret love···of Bauljee···এই মামলার সাক্ষীসাবুদ নথিপত্র থেকে তিনি যেমন বুঝেছিলেন তেমনি বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়।

মানুষের মন খুব দুর্জ্ঞেয়। যে ঘটনা ঘটে যায় এবং আদালতে যার বিচার হয়, খবরের কাগজেও মামলা মোকদ্দমার কোলামে যার বিবরণ ছাপা হয়, আসলে তার আড়ালে সেই অপঘটনের পাত্র-পাত্রীদের মনের একান্ত নেপথ্যে এমন বিচিত্র কতগুলো চিন্তার আলোড়ন থাকে যার খবর কেউ জানে না—জানা সহজ নয়।

বিচারে বাউলজীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তার কিছু নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিস কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই জিনিসগুলোর ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল, বহুমূল্য শাড়ী, জামা, গহনা প্রসাধন সামগ্রী। কোম্পানীর পুলিশ হতাশ হয়েছিল। খবর ছিল, বাউলজীর ডায়েরী লেখার অভ্যেস ছিল। সেই ডায়েরীতে তার নিজের হাতে নিজের গোপন প্রেম কাহিনী লেখা ছিল।

কোথায় গেল সেই ডায়েরী ?

তন্ন তন্ন করেখুঁজেছেপুলিশ। কিন্তু পায়নি। অথচ ডায়েরী বাড়ীতেই ছিল। বিচারের বহু পরে আলমসাহেব এই ডায়েরী হাতে পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তিন দিন তিন রাত্রি দরজা বন্ধ করে পড়েছিল সেই ডায়েরী।

শেষ হলো সেই দিনলিপি।

যেদিন শেষ হলো সেদিন থেকে একেবারে অন্যমানুষ হয়ে গেল আলমসাহেব। মদ ছাড়ল। শিকার ছাড়ল। বাঈজী, মাইফেলী, আমোদ ফূর্তির সেই জগত থেকে অনেক—অনেক দূরে থাকতো। একেবারে সাত্ত্বিক-সাধুমহাত্মের মত জীবনযাপন করতে শুরু করল।

কেন ? কি এমন ছিল বাউলজীর সেই রোজনামচায় ?

বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ার বেশ কিছুদিন পর সেই ডায়েরী নিয়ে স্যার উইলিয়ম জোনসের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল আলমসাহেব। স্যার জোনস গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লেন সেই দিনলিপি। পরের দিনই তদানীন্তন গভর্ণরের কাছে নিজেই আবেদন করে সসম্মানে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন বাউলজীকে।

এই পর্যন্ত লিখে থামল আলবুকেরুখি। সে একসময় অধ্যাপনা করতো। এখন বয়স হয়েছে। রিটায়ার করেছে। এদেশের দাসব্যবসার ওপরে ভিত্তি করে দাসদাসীদের কাহিনী লিখছে!

আজ অনেকক্ষণ একটানা লিখে হাতের আঙুলগুলো টন টন করছে! কলমের ক্যাপ বন্ধ করে জানালার বাইরে চোখদুটো ছড়িয়ে দিল। দূরে আরব সমুদ্রের নীলিম আভাস। তার হঠাৎ মনে হল এই সাগর পাড়ি দিয়েই এসেছিল দুর্দ্ধর্ষ হার্মাদরা, এসেছিল ইংরেজ-ওলন্দাজরা। তারা বন্দরে, বন্দরে কুঠি গড়েছে আর। এদেশের নিরীহ অসহায় মেয়েপুরুষকে পণ্যের মত বিক্রি করেছে— যাক—ভাবতে গেলে দালিয়া বাউলজীর খেই হারিয়ে যাবে। আবার লিখল—

সুপ্রীম কোর্টের কেস রেকর্ডসে আছে এই বিখ্যাত কেসের প্রতিটি দিনের শুনানীর, প্রতিটি সাক্ষীর বিশদ বিবরণ। বাউলজীর সেই ডায়েরীও আছে তার ভেতরে। এই কেসের যাবতীয় নথিপত্রে জলজ্বল করছে এদেশের সে-আমলের বিত্তশালী ও উঁচুতলার লোকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন আর দাসদাসীদের করুণ জীবনের ছবি।

বাউলজীর ডায়েরীতে অনেক দিনের অনেক টুকরো, টুকরো ঘটনার বিবরণ আছে। প্রত্যেকটি ঘটনার শেষে তার নিজস্ব যে অনুভূতির কথা আছে তা যেমন দীর্ঘ তেমনি বেদনাদীর্ণ। সে সব বাদ দিয়ে শুধু ঘটনার দিনের সেই বিচিত্র ইতিবৃত্তই এখানে সংক্ষেপে বলা হলো।

রাত্রি দুইটা
টেরিটি বাজার।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার জীবনের চারিদিকে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। অজানা একটা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কাঁপছে। জানি না, খোদাতালার কাছে কী পাপ করেছি। একদিন এই জীবনকে নিয়েই অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। বাপজান আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাই খানদানী বংশের সুপুরুষ এবং সুশিক্ষিত এক তরুণের হাতেই আমাকে দিয়েছিলেন। আন্তরিকভাবে বহু চেষ্টা করেও তার মন পেলাম না। পরস্ত্রী আর শিকারের নেশায় সে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু তাতেও দুঃখ ছিল না। বড়লোকের ছেলের এসব খেয়াল খুব স্বাভাবিক।

আমরা দুইজনে দুটো নদীর মত পাশাপাশি থাকতাম। দূর থেকে তার কলোচ্ছ্বাসে শুনতে পেতাম অস্থির উন্মত্ততার আভাস। কিন্তু আমার করণীয় কিছুই ছিল না। হয়তো এইভাবেই জীবনের বাদবাকী দিন কয়টিও কেটে যেত। হয়তো তালাক দিয়ে ফয়েজ খাঁকে সাদী করে আলম-সাহেবের জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে যেতাম। কিন্তু কিছুই হলো না। কিছুই করলাম না। তার একমাত্র কারণ—রূপসী দালিয়া।

দালিয়া সুন্দরী যুবতী। আমার স্বামী এতদিন বাইরে কোথায় কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছেন এবং কোথায় কার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছেন সেসব আমার কানে পড়েছে। প্রথম প্রথম হিংসে হতো। তারপর গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর কিছুই মনে হতো না।

কিন্তু আমারই চোখের সামনে যখন দালিয়াকে নিয়ে রাত কাটাতে শুরু করল, যখন লক্ষ করলাম শুধু কামনার জ্বালা নয়—দালিয়ার জন্য রীতিমত আকর্ষণ অনুভব করে আমার স্বামী। তাকে ভালবাসে। আর আমি নারী। কোনটা পুরুষের লোলুপলালসা আর কোনটা ভালবাসা বুঝতে দেরী হয় না। সেইদিন—সেইদিন থেকে আমার মনটা হিংসের চিনচিন করে জ্বলে যেতে

লাগল। আমারই নিজের হাতে স্লেভগোডাউন থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কেনা আমার দাসীকে যে কোনদিন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে হবে—তা কল্পনাও করিনি।

কিন্তু ভবিতব্য—ভবিতব্য খণ্ডাবে কে? আর সত্য অনেক সময় কল্পনার চেয়েও বিচিত্র হয়।

দালিয়ার সঙ্গে আমার স্বামীর মাখামাখি যত বাড়তে লাগল ততই আমার মনে প্রতিহিংসার জ্বালা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করল। আমিও ঘন ঘন ফয়েজ খাঁকে ডেকে ডেকে পাঠাতে আরম্ভ করলাম।

দালিয়ার মাধ্যমে আমার স্বামী আমার প্রতিটি অভিসারের খবর পেতেন আর জ্বলে যেতেন। আমি এতে খুবই আনন্দ পেতাম।

এই ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অঘটন ঘটে গেল ওই হতভাগা দালিয়ারই জন্যে। আমি জানি আগামীকাল ভোরে কোম্পানীর পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে। আমাকে হয়তো সারাজীবন কারাগারের শ্বাসরোধী অন্ধকার চার দেওয়ালে বন্দী থাকতে হবে; হয়তো সেখানেই তিলে তিলে আমি শেষ হয়ে যাবো। তবে আমার যাই হোক, আমি শেষ দিন পর্যন্ত দালিয়াকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো। খোদাতালার কাছে বলবো, দালিয়ার আত্মা যেন শান্তি লাভ করে। আর আমি যেন এই পাপের জন্যে এবং দালিয়ার মত একটা মহৎ প্রাণকে হত্যা করার জন্য বেহেস্তে যাই।

সত্যিই দালিয়া শুধু মহৎ নয়। উদার এবং বিচিত্র এক মনের মানুষ। দালিয়া আমার এবং আমার স্বামীর ভেতরের ক্রমবর্দ্ধমান এই ব্যবধানের জন্য মনে মনে খুব কষ্ট পেত। নিজেকেই দায়ী ভাবতো। তাই সে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে তার মালিকানীর বাড়ীর আবহাওয়াকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে চেয়েছিল।

সে একটা 'স্লেভ'। দাসদাসীদের ভেতরে মানুষের মন আছে, বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে—তা আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু দালিয়াই আমাকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল যে 'স্লেভ' হলেও তারা মানুষ! যা হোক এইবার ঘটনাটা বলি—

সারাদিনের শেষে মাত্র একবার আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হত। দেখা হত সন্ধ্যায় খাওয়ার টেবিলে। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা এক সঙ্গে খেতাম। দিনের খাওয়াটা তিনি বাইরে কাছারী ঘরেই খেতেন। কোনদিন শিকারে

বেরিয়ে বাইরেই কোথাও খেয়ে নিতেন, কি কোথায় মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতেন তা আমি জানতেও পারতাম না। তার কথা পরে বলছি।

ঘটনার আগের দিন আমি টের পেয়েছিলাম—অনেক রাত্রে দালিয়া আমার স্বামীর ঘর থেকে এসেছিল। ফিরে এসে তার নিজের ঘরে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়েছিল। প্রতিদিনই তাই করে। সে নিজের ঘরে আমার পরেই আলো নিভিয়ে দেয় এবং একটু পরেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম হল। আমি দালিয়ার ঘর থেকে গুমরে গুমরে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। আমার মনে হল হয়ত আমার মত্তপ স্বামী শুধু ওকে উপভোগ করেনি, ওর উপরে অকথ্য অত্যাচারও করেছে। দাসীদের ওপর অত্যাচার তো নতুন কিছু নয়। কি হবে যেয়ে—কি হবে খোঁজ করে; কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কান্নাও বাড়তে লাগল। আমি শেষ বাধ্য হয়েই ওর ঘরে গেলাম।

দালিয়া দরজা খুলল। তাকে দেখে একটু অবাক হলাম! ওর রক্তলাল সিল্কের শাড়ী। পাতলা হাল্কা সবুজ রঙের ব্লাউজের আড়ালে সুডৌল বুকের আভাস। গম্বুজের মত কালো খোপায় চক্রাকারে জড়ানো বেলফুলের মালা! জলভরা দুচোখে সুর্মাটানা।

আমি একটু অবাক হলাম। সাজগোজ কিছুই পাল্টায়নি। আমারই স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ফিরে এসে এখন ঘরে শুয়ে কাঁদছে। আমাকে দেখেই আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলল—আমাকে বাঁচাও মালিকানী—আমাকে বাঁচাও—এখান থেকে দূরে কোথাও আমাকে সরিয়ে দাও—

নে—রাত দুপুরে আর বেশী ঢং করিস না। একটু থেমে যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে কটু তিক্ত স্বরে বললাম, হয়তো তোকে আদর করে অত্যন্ত বেশী সরাব খাইয়েছে তাই নেশার ঝোঁকে সামলাতে পারছিস না—বলেই চলে এলাম। তাকে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, দেব—এই দুনিয়ার বুক থেকেই ওই দুষ্ট মাগী আর ওই পশু দুটোকেই একেবারেই সরিয়ে দেব—

আমি শুধু একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সুযোগ পাওয়া গেল, পরদিন সন্ধ্যায় খাওয়ার টেবিলে। আমার এবং আমার স্বামীর বরাবরের অভ্যেস ছিল রাত্রির খাওয়ার পর দুজনে দুই গ্লাসে সরবৎ খেতাম। ঘোলের সরবৎ। দালিয়া তৈরী করতোও খুব চমৎকার।

আমার খেতে আসার আগে দালিয়া খাওয়ার ঘরে বসেই দই থেকে ঘোলের সরবৎ তৈরী করতো এবং টেবিলে ডিসে ডিসে খাওয়ার সাজাতো। ঘটনার দিন সকালে আমি নিজের হাতে এক ভাঁড় দই রেখেছিলাম মিট্‌সেফে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, খাওয়ার কিছু আগে দালিয়া এসেই সেই ভাঁড় জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আমি খপ করে ওর গলা টিপে ধরে চিৎকার করে উঠলাম—বল কার হুকুমে তুই এক হাঁড়ি দই বাইরে ফেলে দিলি?

সে কোন কথা বলল না। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমি শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে ওর সর্বাঙ্গে আঘাত করতে লাগলাম। পাঁচ ছয়টা ঘা মারতেই সে টলে পড়ে। সে চিঁ চিঁ করে বলার চেষ্টা করল—আমাকে মের না—মেরো না দালিকানী। একদিন বুঝবে আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম—

আমার তখন ওর কথা শোনার মত মনের অবস্থা ছিল না। আমি তখনও এক পাগলের মত মেরে চলেছি। হঠাৎ দালিয়া গোঁ গোঁ করে উঠল। মুখ দিয়ে কেমন সাদা গ্যাঁজলা উঠতে লাগল।

হঠাৎ মনে হল, জানালা থেকে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল কিম্বা আমার স্বামীই খেতে এসেছিলেন—এই অবস্থা দেখে চলে গেলেন—বুঝলাম না—

মালিকানী শোন শোন—কাছে এস—দালিয়ার চোখের দৃষ্টি উর্ধে। হাঁফাচ্ছে। ঘামছে। প্রাণটা গলার কাছে ধুক ধুক করছে। আমি চমকে উঠলাম। শঙ্কর মাছের চাবুকে তো কেটে যায়। রক্ত পড়ে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠবে কেন?

আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লাম ওর মুখের ওপরে। দালিয়া খুব ক্ষীণ এবং অস্ফুট স্বরে বলেছিল—মালিকানী তুমি যে দইয়ের হাঁড়িটায় বিষ মিশিয়ে রেখেছিলে সেই দই আমি—

তুই কি বলছিস দালিয়া, আমি চিৎকার করে বললাম।

ততক্ষণে পুলিশ এসে পড়েছে। আমার পাষণ্ড স্বামীই খবর দিয়েছিল। পুলিশ এসে দেখল, ঘরে চাবুক পড়ে রয়েছে। তারা একবারও দালিয়ার মৃতদেহের দিকে ভাল করে নজর দিয়ে দেখল না, ওর সারা দেহে মারাত্মক বিষের লক্ষণ ফুটে উঠেছে—

আলমসাহেব প্রতিপত্তিশালী লোক। তার অভিযোগে চাবুক মেরে দাসী

হত্যার দায়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। পৃথিবীর আর একটি প্রাণীও জানতে পারল না, বিষ মেশানো যে ঘোলের সরবৎ খাইয়ে ওদের দুইজনকে খুন করবো ঠিক করেছিলাম—সেই বিষ খেয়ে হতভাগী তার জীবনের জ্বালা জুড়ালো। আজও মনে হয়, দালিয়ার হাসি হাসি সরল মুখখানা। কানে বাজে তার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর—মালিকানী তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি—তোমার জন্যই আমি সুখের মুখ দেখতে পেয়েছি—

সত্যিই আমাকে ভালবাসতো। তাই আমি আর আমার স্বামীর মাঝখান থেকে সে নিঃশব্দে সরে গেল। কেউ বিশ্বাস করবে, বেনিয়াটোলার স্লেভগোডাউন থেকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কেনা বাঁদীর ভেতরে এতবড় একটা মন আছে—

—কি ব্যাপার দাদু তুমি এখনও লিখছ! ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল বিশবাইশ বছরের একটি তরুণী। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। শক্ত মজবুত গড়ন। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কালো কুচকুচে একটা বাঘিনী! বলল, এখন ছেড়ে দাও—অনেকক্ষণ লিখেছ—

তার কথা যেন শুনতে পেল না আলবুকেরুথি। উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, এতক্ষণ যা লিখেছি, একটু পড়বি দিদি? নিশ্চয়ই পড়বো। পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো সাজিয়ে নিয়ে দ্রুত পড়ে ফেলল মার্থা। ব্যথার ছায়া নেমে এল তার মুখে। বলল, দালিয়ার জন্য বড় কষ্ট হয়—

তুই একটা দালিয়ার কথা ভাবছিস দিদি, উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল আলবুকেরুথি, বলল কত লক্ষ লক্ষ দালিয়াকে যে 'স্লেভের' ব্যাপারীরা ধরে নিয়ে যেত! জানিস, গোয়া থেকে আফ্রিকার মোজাম্বিক পর্যন্ত রেগুলার ছয়টা জাহাজ যাতায়াত করতো। প্রতিটি জাহাজের খোলে গোরু ছাগলের মত গাদাগাদি করে রাখা থাকতো এদেশী মেয়ে পুরুষ! আর ফিরতী জাহাজে আসতো কাফ্রী স্লেভ! কলকাতায়, দিল্লীতে বড় বড় ধনী অভিজাতদের ঘরে কাফ্রী দাসদাসীর খুব ডিম্যাণ্ড ছিল—

বলছো কি দাদু?

কোন কথা বলল না আলবুকেরুথি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজ থেকে একটা কালো নোট খাতা বের করল। বলল, এই দেখ, ১৭৮০ সালের হিকিজ গেজেটের পাতা থেকে একটা বিক্রি আর একটা কেনার বিজ্ঞাপন

টুকে রেখেছি—মার্থা দেখল, এক ইংরেজ ভদ্রলোক কলকাতা থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—"দুইজন কাফ্রী দাসী চাই। তাদের বয়স চোদ্দ থেকে চব্বিশের ভেতরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফরাসী কায়দায় রান্না এবং ঘরের যাবতীয় কাজ জানা চাই। কিন্তু তাদের পান দোষ থাকলে চলবেনা"—

বিক্রির বিজ্ঞাপনের নমুনা—"আবিসিনিয়ার অধিবাসী। মদের ব্লেণ্ডিং এবং রান্নার কাজ জানে। মজবুত স্বাস্থ্য। যদি কেউ কিনতে চান, নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।"

কোন কথা বলল না মার্থা। ঘরের ভেতরে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল আলবুকেরুখি, কলকাতাই ছিল দাসদাসী কেনাবেচার সবচেয়ে বড় মার্কেট। শুধু বেনিয়াটোলা নয়, চিৎপুর, অহীরিটোলায়, বাগবাজারেও এরকম গোডাউন ছিল। ব্যাপারীরা এইসব কাছারীতে স্লেভ নিয়ে এলেই তাদের রেজিস্ট্রি করতে হতো—রেজিস্ট্রেশন ফি কত ছিল জানিস?

কত?

মাথা পিছু চার টাকা চার আনা।

আচ্ছা দাদু, ব্যাপারীরা এত স্লেভ পেত কোথা থেকে?

এক্সটার্নাল আর ইন্টার্নাল অর্থাৎ বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য এই দুটো শব্দ অন্যান্য ট্রেডের মত স্লেভট্রেডেও ছিল দিদি। একটু থেমে বলল, মধ্যএশিয়া থেকে আরবদেশীয় স্লেভ মার্চেন্টরা স্লেভ নিয়ে আসতো কাথিয়াবাড়ে, কচ্ছে আর সিন্ধুপ্রদেশে। তারপর তারা নানা হাত বদল হয়ে আসতো গোডাউনে। আর ইন্টার্নাল ব্যবসাটা চালাতো দেশীয় ডাকাত, ঠগী, চারণ কিম্বা গোস্বামী ঠাকুরের ছদ্মবেশধারী দুর্বৃত্তরা। তারা সুযোগ বুঝে মেয়ে পুরুষ কি শিশুদের চুরি করে এনে কলকাতার স্লেভ মার্চেন্টদের কাছে বিক্রি করতো—

আশ্চর্য! তুমি তো স্লেভট্রেডের ওপরে অনেক পড়াশুনা করেছ দাদু! হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মার্থা। লাল টুকটুকে জিহ্বাটা প্রায় আধ হাত খানেক বের বলল, ছিঃ ছিঃ গল্প শুনতে শুনতে ভুলেই গেছি তোমার কফির কথা—ঝড়ের মত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, দাদু, তুমিও তো একবার মনে করিয়ে দিতে পারতে—

ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার জমেছে। বাইরে বিকেলের কোমল ছায়া

পড়েছে। আলবুকেরুথির মনে হল মার্থার কথা। তাকে অত্যন্ত ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। সেইজন্যই কি দাসদাসীর হিস্ট্রিতে ওর এতটা ইন্টারেষ্ট—না, কি দীর্ঘ বিশবছর বাদে জেনে ফেলেছে যে সে তার নিজের নাতনী নয়, এবং ওর জন্মলগ্নের—

—দাদু, এই নাও কফি। এখন আর লিখবে না বুঝলে—

॥ দুই ॥

কয়েক দিন পর।

লিখতে শুরু করার আগেই সেলফ থেকে একটি চটি বই টেনে নিল আলবুকেরুথি। দশ পাতার একটা ছোট্ট বই। কিন্তু কত অজস্র দাসদাসীর বুকচাপা আর্তনাদ, তাদের দেশী-বিদেশী প্রভুর হুঙ্কার আর তাদের হিংস্র কণ্ঠস্বর যেন স্তব্ধ হয়ে আছে এর অক্ষরে অক্ষরে। এই বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে তার মন ভেসে গেল। ভেসে গেল সেই দূর অতীতে—

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ, ২৬শে আগস্ট। হুগলী নদীর চরে৹শীতের সকালের হলদে রোদ সিল্কের ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে দলে দলে লোক ছুটছে চরের দিকে। কিষানেরা মাঠের কাজ ফেলে, জেলেরা জাল ফেলে দৌড়চ্ছে চরের দিকে। মেয়েরা ছুটছে কোলে ছেলে নিয়ে।

কী ব্যাপার? এ ওকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ জানে না। কিন্তু ছুটছে সবাই। আবার কেউ কেউ দৌড়তে দৌড়তে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ছে, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে—কে, কোথায় পড়ে রইল তার দিকে তাকানোর সময় নেই কারো। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছে তারা। যদি শেষ হয়ে যায়—যদি দেখতে না পায়—

সত্যি একটা দৃশ্য।

ধূ-ধূ বালুচর লোকে লোকারণ্য। তাদের ভীড় কাটিয়ে গেলে দেখা যাবে, লালমুখো দুই গোরা দুই দিকে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে খোলা পিস্তল। নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানার মত সেই পিস্তল নাচিয়ে একজন আর একজনকে বলছে, শোন প্রেটন, লুক্রেটিয়াকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ, যদি ভাল চাও তো বের করে দাও—

দেখ বার্কেলি, আর একবার যদি—তোমার ওই পেয়ারের মেডস্লেভের নাম করো তাহলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব—

কী, তুমি তাহলে লুক্রেটিয়াকে দেবে না ?

তুমিও একদিন আমার ম্যানস্লেভ ইজরাইলকে আটকে রেখেছিলে মনে আছে ?

হ্যাঁ সে অন্যায় করেছিল। আমার বাংলোর কম্পাউণ্ডে ঘোড়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল—তাই শাস্তি দিয়েছিলাম—

বার্কেলি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কিন্তু তোমার মেডসার্ভেণ্টকে আমি বিছানায়—

সাট আপ ! বাঘের মত গর্জে উঠল প্রেটন। পিস্তলের ট্রিগারের ওপরে হাতের আঙ্‌লটাও চেপে নেমে আসছিল—

পালাও পালাও—শীগ্‌গীর পালাও—জনতার ভেতরে যেন মুহূর্তে মহাপ্রলয় নেমে এল। হুগলী কুঠির বড় সাহেব মিষ্টার ক্রীকলকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখেই তারা পালাতে চেষ্টা করল। তারা জানে ক্রীকল সাক্ষাৎ যমদূত। তার অত্যাচারে এঅঞ্চলে বাঘ গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।

ঘোড়া থেকে নেমে যাদের হাতের কাছে পেল তাদের হাণ্টার দিয়ে বেধড়ক মারতে লাগল। কেউ ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। কেউ গাছের মগডালে উঠে জান বাঁচালো। তারপর যখন চর জনশূন্য হলো তখন এল দুই সাহেবের কাছে। ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করে বলল, ছিঃ ছিঃ—জাতজন্মো আর কিছু রাখলে না তোমরা ! খাস ইউরোপীয়ান হয়ে একটা নেটিভ স্লেভ মেয়ের জন্য ডুয়েলে নেমেছো—

হুগলী কুঠির বড় সাহেব ক্রীকলের হাণ্টার খেয়ে হুগলীর দেহাতী লোকরা হয়তো সেদিন চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের টুঁটি চিপে ধরে থামিয়ে দিতে পারে নি সে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আটের দশকে দাসদাসীর ব্যবসার মূল্যবান দলিল এই বইতে পরিষ্কার লেখা আছে—A dispute arose between two Europeans, not many miles from Serampore about a native maid slave.……

শুধু যে স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়ে-স্লেভ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতো কোম্পানীর কর্মচারীরা তা নয়। খোলাখুলি কাগজে চমকারজনক বিজ্ঞাপন দিত—"দুইজন উদ্ভিন্নযৌবনা দাসী চাই। তাদের হাতপায়ের গড়ন সুডৌল হবে। চোখ

হুটো হবে ডাগর আর ঘন-কালো। তাদের ক্রেতার শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে নিয়মিত"......

যুবতী দাসীরা ছিল কোম্পানীর সাহেবদের আর দেশীয় বড়লোক বাবুদের লালসা চরিতার্থ করার প্রধান উপকরণ। সমাজে তার বিষময় ফল ফলেছিল কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, ভারতের বড় বড় শহরে সাহেবদের কুঠিতে। বড়লোক, বনেদী জমিদারদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই একটি দুটি সুঠামতনু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সুশ্রী তরুণী দাসী থাকতো। তাই সেইসব শহরে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যেত যাদের আকৃতি, গায়ের রঙ ছিল নিগ্রোর মত।

বলাবাহুল্য তারা জারজ দাসদাসীর সংখ্যা বাড়াতো তারা। মানবতা-বিরোধী ঘৃণিত প্রথা বিলুপ্ত না হলে গোটা দেশটাই দাসদাসীর দেশ, দাসদাসীর সমাজ হয়ে যেত,—বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলবুকেরুথি।

কিছুই লিখতে ইচ্ছে হলো না—কি লিখবে, কেমন করে—কোথায় থেকে আরম্ভ করবে! পুরো তিন—তিনটি শতাব্দী ধরে এই জীবন্ত পণ্য নিয়ে যে জঘণ্য ব্যবসা চলেছে, সেই অসহায় মানুষগুলোর ওপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছে—নিরবচ্ছিন্ন সে-ইতিহাসের কি শেষ আছে? সেই চটি বইটির পাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আর একটি ঘটনার বিবরণ তার চোখে পড়ল। সে কাহিনী যেমন করুণ তেমনি বিচিত্র—

কলকাতা থেকে কিছুদূরে একটি গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁখ বেজে উঠল। পাখিরা বাসায় ফিরে এল। নামল সন্ধ্যার অন্ধকার। ঠিক এই সময় এক সাহেব এই গ্রামের পাশ দিয়ে আসছিল। কাঁচামাটির সড়ক থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো উড়ছিল। গ্রামের নিস্তব্ধ পরিবেশকে শিউরে দিয়ে শব্দ হচ্ছিল—খট্—খট্—খট্—

আ—উঃ বাবা গো—মরে গেলাম—আর মেরো না—মেরো না—হঠাৎ একটা বুকফাটা আর্তনাদের সুর যেন ভেসে এল দূরদিগন্ত থেকে। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়া থামালো সাহেব! বুঝতে চেষ্টা করল, চিৎকারটা কোনদিক থেকে আসছে। যেদিকে তাকাও, ভুসো ভুসো কালির মত অন্ধকার, দিগন্তের ভেতরে জবুথবু হয়ে মুখ লুকিয়ে আছে এক একটা গ্রাম! কোনদিকের কোন গ্রামে যাবে সে!

উঃ বাবা গো—আমি—আমিও তো মানুষ—আবার সেই করুণ কান্না-জড়ানো চিৎকার কানে এল।

এবার—এবার সেই শব্দ অনুসরন করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সেই সাহেব। যত অগ্রসর হতে লাগল—তত সেই কান্নার শব্দটা তীব্র হয়ে উঠল।

গ্রামের সীমানায় একটা বকুল গাছের গুঁড়িতে ঘোড়া বেঁধে রেখে এগিয়ে গেল সে। বেশ বর্ধিষ্ণুগ্রাম। বাড়িতে বাড়িতে ধানের গোলা। গোয়াল ঘর। টিন দিয়ে ছাওয়ানো চাল। গ্রামের ভেতরে পা দিয়ে দেখল, একটা অদ্ভুত দৃশ্য—

ছেলে-বুড়ো সবাই ছুটছে। একজনকে সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছো—কি হয়েছে?

বাবুর বাগান বাড়ীতে যাচ্ছি সাহেব—

কেন? সেখানে কি হয়েছে?

অতশত আমি জানি না সাহেব। সবাই ছুটছে—আমিও ছুটছি—বলেই সে পড়ি কি মরি করে দৌড়তে লাগল।

কি হয়েছে হে? তুমি বলতে পারো? আর একজনকে ধরল সাহেব। সে বলল, আমাদের জমিদারবাবু তার বাঁদীকে নিয়ে কি যেন করবে—

সেই লোকটার সঙ্গে সাহেব এল . জমিদারবাবুর বাগানবাড়ীতে। চারিদিকে তার কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল এক বাগান। সারি সারি আম আর লিচু গাছের নীচে জমাট অন্ধকার পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দৈত্যের মত উঁচু মাটির দোতলা একটা কুঠির সামনে। তার চারিদিকে খোলা বারান্দায় লোক গিজগিজ করছে। আর সেই কুঠির দক্ষিণে নারকেলী কুলগাছের ডালে মোটা রশিতে ঝুলছে একটি মেয়ে। ষোল-সতের বছর বয়স হবে। তার গা বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে! বুকের ওপরে ঝুলে পড়েছে মাথাটা। ছেঁড়া জামার আড়ালে তার কঠিন দুটো স্তনের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! পরনে কোনরকমে জড়ানো রয়েছে একটা গামছা! নীচে মাটিতে মেয়েটির দুইদিকে দুইজন বরকন্দাজ। তাদের হাতে একটা লিকলিকে বেতের চাবুক। বাতাসে থর থর করে কাঁপছে চাবুক দুটো। যেন কাঁচা পেয়ারার মত ডাঁসা ডাগর-ডুগোর মেয়েটার পিঠের নরম তুলতুলে মাংস খুবলে খাওয়ার উল্লাসে নাচছে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত দুদিকে ঝুলে পড়া গোঁফ দুটোর শেষ দিকটা একটু পাকিয়ে নিয়ে হাঁকলেন জমিদারবাবু—

এই বান্দাগুলোকে এবার নিয়ে আয় দেরী করিস না—আমাকে আবার সদরে যেতে হবে—

একজন গোমস্তা জন-পাঁচেক লোককে গলা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে এল। মেয়েটির সামনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল তাদের। জমিদারবাবু এবার গোঁফে তা দিয়ে বলল, শোন—সবাই শোন—এই মেয়েটা আমার বাঁদী। নগদ বারো টাকা চার আনা দিয়ে ওকে আমি কিনেছিলাম চুঁচুড়া কুঠির মেমসাহেবের কাছ থেকে। সাহেব এখানকার পাট চুকিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিল। তাই খাট-চেয়ার-টেবিলের সঙ্গে এই মাগীকেও নিলামে বিক্রি করে দিয়েছিল। সাহেবসুবোর কাছে ছিল। আদবকায়দা জানে। একটু-আধটু ইংরেজীও বলতে পারে। তাই আমি একটু বেশী দাম দিয়ে একে কিনে ছিলাম।—একটু থামল জমিদারমশায়। মোটাসোটা মানুষই। একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ে। আবার চিৎকার করে বলল, কিন্তু তোমরা তো দেখলে একশো চাবুক মারা হলো। তবুও কবুল করল না—ও বেটী একটা আস্ত বিচ্ছু—

'এখনও তো আরও একশো বাকী আছে বাবু', তার এক মোসাহেব হাতজোড় করে বলল। জমিদার কিছু বলল না। উঠে এসে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে বলল, দেখছো কুসুমের পিঠ কেটে রক্ত ঝরছে। একটু বেচাল দেখলে তোমাদেরও মাংস কুকুর দিয়ে খাওয়াবো বুঝলে—ও কি রকম কষ্ট পাচ্ছে দেখতে তোমাদের ডেকেছি—

একটা লোক কিছু বলল না। মনিবের মুখের ওপর কিছু বলতে নেই। ওরা যে দাস। এবার মেয়েটির সামনে যেয়ে শেষ চেষ্টা করল জমিদার। বলল শোন কুসুম—বল—বল, আমার ঘরের আলমারী থেকে দুশো টাকা তুই নিয়েছিস? তুই সকালে ঘর মুছতে গিয়েছিলি—

আমি নেই নি বাবু, চিঁ চিঁ করে বলল হতভাগী। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত গর্জে উঠল বাবু, লাগাও চাবুক—লাগাও—আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না—

সপ্—সপ্—সপ্—বাতাসে বেতের শব্দ উঠতে লাগল। আর কুসুম তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে শুরু করল আমি নেই নি—আর মেরো না—মরে যাবো—মেরো না—

বল মাগী—একবার বল—তুই নিয়েছিস—

না বাবু—আমি তোমার টাকা নেই—

ইস এখনও—তুই কবুল করবি না—লাগা চাবুক—

গুনিশ, একশোর ওপরে কটা হয়েছে—

মাত্র পনেরটা হয়েছে—হুজুর—এখনো পঁচাশীটা বাকী আছে—

কিন্তু আরো পাঁচ ঘা মারতেই মেয়েটির মাথা হেলে পড়ল ডান দিকে। মুখ দিয়ে সাদা গ্যাঁজলা উঠতে লাগল। দর্শকদের ভেতর থেকে ফিসফিসানি শোনা গেল—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে রে—হতভাগী ফিট হয়ে গেছে—

দড়ি খুলে নামানো হল তার রক্তমাথা দেহটা। এবার ওটাকে কুয়োর পাড়ে নিয়ে চল—জমিদার হুকুম করল। কাছেই কুয়ো। বালতি বালতি জল মাথায় দিতেই কুসুম চোখ মেলে তাকালো। এবার টাকার শোকে উন্মত্ত সেই পিশাচ তার অনুচরদের নির্দেশ দিল, এবার মাগীকে পুকুরের পাড়ে নিয়ে যা—জলের ভেতরে মাথাটা খুঁসে ধরবি, যতক্ষণ ওর দম বন্ধ না হয়—

এইবার পাইক বরকন্দাজরা তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল পুকুরের পাড়ে। যেই তাকে জলে নামাতে গেল—

থাম তোমরা—যেন বাজ পড়ল। ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই সাগরপারের বিদেশী মানুষটি। লাল মুখ, কটা চামড়া দেখেই জমিদার দাঁত বের করে হেসে বলল, স্যার-আমার-মানি-টু হাণ্ড্রেড-স্যার-চুরি-করেছে ও আমার, মাই ফিমেল স্লেভ স্যার—

চুপ রও—ইউ ক্রুয়েল বিষ্ট—তুমি টাকার শোকে ওকে খুন করছো—ওকে মেরে ফেললে তুমি টাকা ফিরে পাবে—

ভূতের মুখে রামনাম! জমিদার অবাক হলো। এ কেমন গোরা রে বাবা! দাসীকে মারলে বকে, ওরা যে কথায় কথায় ওদের পিঠে লাথি বসিয়ে দেয়—সামান্য কটা টাকায় কেনা পশুগুলোর ওপরে অত্যাচারের একচেটিয়া অধিকার কি শুধু ওদেরই?

জমিদার জানতে পারল না সাহেবের পরিচয়। সেই রাত্রেই পাল্কীতে করে কুসুমকে হুগলীর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিল সাহেব। সুস্থ হওয়ার পর সে কুসুমকে নিজের কাছে রেখেছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণের শেষে ফুটনোটে আছে সাহেবের পরিচয়—নাম হেনরী ষ্টার্ক! বিলেতী একটা কাগজের রিপোর্টার। সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছিল ইণ্ডিয়ার স্লেভট্রেডের অবস্থা!

ইংল্যাণ্ডের হাউস অফ কমন্সে তখন এই দাসপ্রথা তুলে দেওয়ার জন্য তর্কের ঝড় উঠেছিল। তাই তার আসা।

ঢং—ঢং—ঢং—আটটা বেজে গেল!

আলবুকেকুখি চমকে উঠল। এত বেলা হয়ে গেল—আজ কিছুই লেখা হলো না। তার চোখের সামনে দিয়ে যেন মূক পশুর মত একদল মেয়ে পুরুষের একটা নিঃশব্দ মিছিল চলে যেতে লাগল। উস্কো খুস্কো চুল। ছেঁড়া নোংরা জামা কাপড় তাদের। কারো মুখ থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে। কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, কারো হাত কাটা, কারো পা কাটা, চোখগুলো জলে ভরা। তাদের অসহায় দৃষ্টি যেন চিৎকার করে বলছে, যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের ওপরে যে চরম অত্যাচার হয়েছে—সে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখ—সারা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দাও—তাদের সমবেত গলার আকুল কান্নার শব্দটা তার বুকের ভেতরে হাহাকারের মত বাজতে লাগল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার অবিচারের কাহিনী নিয়ে কেমন করে বই লিখবে। পাঠকের মন শিউরে উঠবে না?

দাসপ্রথার মূল্যবান দলিল সেই ছোট বইটির পাতা ওল্টাতে লাগল আশায় আশায়—যদি একটি—অন্তত একটি উদারতার নজীরও মেলে। এই 'লিভিং কমোডিটি'র মালিকরা প্রত্যেকেই কি খুদে দানব ছিল? বইটির একেবারে শেষের দিকে মিলল একটা আশ্চর্য ঘটনা—

টমাস লিচ নামে এক সাহেব মারা গেল। তখন হলোওয়েল বাংলার গভর্নর। তিনি এলেন লিচের কুঠিতে। দেখলেন, লিচের মরদেহ জড়িয়ে ধরে দুটো ছেলেমেয়ে অঝোরে কাঁদছে—

কী ব্যাপার! ছেলেমেয়ে দুটোর গায়ের রঙ কালো। নেটিভ। ওরা খাস একজন ইউরোপীয়ানের ডেডবডি' জড়িয়ে ধরে কাঁদছে!

তোমরা কে—কাঁদছো কেন?

সাহেবকে দেখেই তাদের কান্না থেমে গেল। লিচকে ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। হলোওয়েল সস্নেহে আবার বলল, তোমাদের কোন ভয় নেই —বলো তোমরা কে?

ওরা সাহেবের স্লেভ স্যার, লিচের এক প্রতিবেশী বলল।

স্লেভ! হলোওয়েল চিন্তিত হলো। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল মৃতের কোন ওয়ারিশ না থাকলে তার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে স্লেভদেরও নিলামে তুলতে হতো! হলোওয়েল তার সহকারীকে জিনিসের লিষ্ট করতে বলল। সেই তালিকার ওপরে লেখা হলো List of the articles of the deceased Mr. Tomas Leech সেই তালিকার এক নম্বর হলো, ডায়না—ফিমেলস্লেভ,

—বয়স বারো, আর তুই নম্বর গোমেশ, মেলস্লেভ, বয়স পনের…আর তারপরেই ডিভান টিসেট, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদির দীর্ঘ তালিকা!

কাগজপত্র প্রস্তুত হলে হলোওয়েল যথারীতি তাদের নিলামে তুলল। দেখতে শুনতে স্মার্ট। ঘরের সব কাজ জানে দুইজন। অতএব চড়চড় করে দাম উঠতে লাগল। দাম উঠতে উঠতে ছেলেটির উঠল একশো আট টাকা চার আনা তিন পাই আর মেয়েটির হলো উনপঞ্চাশ টাকা নয় আনা ছয় পাই। সেই দামে তাদের যখন ছেড়ে দেবে ঠিক করল হলোওয়েল, ঠিক সেই সময়ে—অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

লিচের চেয়ার টেবিল খাটও বিভিন্ন আসবাব পত্রের স্তূপের ভেতরে ঘাড় গুঁজে বসেছিল তারা। ডায়না আর গোমেশ। নিলাম শেষ হলে তারা মাথা তুলল। ওদের চোখে জল টলমল করছে। কিন্তু তাদের ক্রেতা লবণ ব্যবসায়ী মিঃ কম্পটনের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল গোমেশের চোখের দৃষ্টি! তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। লিচের উদার, সৌম মুখখানা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। তার গভীর স্নেহের হাজারো স্মৃতি তার মনের যন্ত্রণা আরও তীব্র করে উঠল। তার গালের দুদিকে ঠেলে ওঠা হাড়ের ওপরে দুটো অশ্রুবিন্দু চিকচিক করতে লাগল—

কি ব্যাপার—তোমরা কাঁদছ কেন?

ওরা কোন কথা বলল না। হলোওয়েল জানে, ওরা স্লেভ—ওদের বুক ফেটে গেলেও মুখ খুলবেনা ওরা। হয়তো লিচের কথা এখনো ভুলতে পারছে না—তাই কান্নাকাটি করছে। কয়েকদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে —এই ভেবে হলোওয়েল যেই তার গাড়িতে উঠতে গেল অমনি গোমেশ ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরল, সাহেব তুমি আমাদের বাঁচাও—আমরা ওই সাহেবের কাছে যাবো না—

সে কী! মিস্টার কম্পটন কিনেছেন—পেমেণ্ট হয়ে গিয়েছে—বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল হলোওয়েল, কেন তোমরা যাবে না—খেলা পেয়েছ না কি?

না—না সাহেব, তার চেয়ে তুমি তোমার পিস্তল দিয়ে এখানে খুন করো —হলোওয়েলের পায়ের কাছে মাথা কুটতে লাগল গোমেশ। দেখতে দেখতে কপাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে শুরু করল। রক্তে আর চোখের জলে লেপটে তার মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল।

স্যার, আমি আনউইলিং হর্স নিয়ে কি করবো। কম্পটন মুখ ভারী করে

তার টাকাটা ফেরৎ নিয়ে চলে গেল। ডায়না ভীরু হরিণীর মত কাঁপছে। গোমেশ কেন এরকম করছে বুঝতে পারছেনা। আবার সামনে জিজ্ঞাসাও করতে পারছেনা। অস্বস্তিকর সেই পরিবেশ থেকে চলে গেল হলোওয়েল। তার সহকারী ষ্টুয়ার্টকে নির্দেশ দিয়ে গেল—গোমেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে।

এবার বলো তো, কম্পটনের সঙ্গে গেলে না কেন? ষ্টুয়ার্ট বলল।

স্যার কম্পটন সাহেব মানুষ নয়, গোমেশ বলল ভয়ে ভয়ে, আমরা শুনেছি, কদিন আগেও তার ফিমেল স্লেভ পেগীর মাথাটা ফুটন্ত গরম জলের ভেতরে খুঁসে ধরেছিল। উনি নাকি তার স্লেভদের আঙুলে সুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে মজা দেখেন। স্লেভরা যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করে তখন নাকি কম্পটন সাহেব হো হো করে হাসে—

আপনারা যে কেউ একজন রাখুন সাহেব, বীভৎস অত্যাচারের বিবরণ শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডায়না। ষ্টুয়ার্ট বলল, দেখি—গভর্নর সাহেবকে সব জানাই—

হলোওয়েল তার সহকারীর মুখে বৃত্তান্ত শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ওদের আমার কুঠিতে নিয়ে এস—

এদেশে তার কর্মজীবনের মেয়াদের শেষদিন পর্যন্ত ডায়না আর গোমেশকে খুব যত্ন করে রেখেছিল। কিন্তু—

এসব তো ১৮৫৬ সালের কথা। তখন বিলেতের সাহেবরা তথা সারা দুনিয়ার মানুষ এই জঘন্য প্রথার ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। শেষের দিকে দাসদাসীর প্রতি উদারতার এই রকম নজীর তো মিলবেই। কিন্তু এদেশের দাসদাসীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে হলে—যেতে হবে অনেক—অনেক আগে সেই স্মরণাতীত সুদূর অতীতে যখন এই বেদ-মনুসংহিতা জাতকের দেশেও অবাধে মানুষ কেনা-বেচা চলতো, যখন—

এ কী! দাদু—তুমি এই বইটা হাতে নিয়ে বসে এত কী ভাবছ? মার্থা এল। লেখার প্যাডের দিকে তাকিয়ে বলল, ওমা—আজ এক পাতাও লেখ নি?

আলবুকেরুথি কোন কথা বলল না। স্থির চোখে মার্থার দিকে তাকালো। ওর কুচকুচে কালো রঙ—

দাদু, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ?

না রে না—অপ্রতিভ হাসি হেসে আলবুকেরুথি বলল, সেকেণ্ড চ্যাপ্টারে যে কি লিখবো তাই ভাবছি দিদি—

॥ তিন ॥

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসা হলো—দাসব্যবসা।

দাসব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল যুদ্ধবন্দী থেকে। যুদ্ধে একজন হারে। আর একজন জেতে। যারা হারে, সেই দুর্ভাগাদের বন্দী করে রাখতো বিজয়ীরা। তারপর তাদের পশুর মত নিজেদের কাজে খাটাতো। তাদের বলতো স্লেভ অর্থাৎ দাস, আলবুকেরুখি একেবারে গোড়া থেকে লিখতে শুরু করল—আমাদের দেশের সুপ্রাচীনকালের মহাকাব্য রামায়ণেও দেখা যায়, 'শুনশেপ্য' নামে এক দাসকে বিক্রি করা হচ্ছে; মহাভারতের লোপামুদ্রাকে দেখা যায় শত শত দাসী পরিবৃত হয়ে বসে আছে। মনে পড়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের সেই দুর্ভাগিনী তরুণী দাসী মঙ্গলার করুণ ইতিবৃত্ত—

মঙ্গলা ছিল এক রাজার দাসী। নিয়ম অনুযায়ী তার গর্ভের পরপর পাঁচটি সন্তানকেই রাজা দাসে পরিণত করেছিল। তারা কেউ জানে না, যে, সে তাদের 'জননী'। তাই 'মা' বলে ডাকে না। মা হওয়ার কষ্ট করে চলেছে সেই কবে থেকে কিন্তু 'মা' ডাক শুনতে পাবে না? নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য মনের ভেতরটা পুড়ে যায়। তাই মনে মনে নিজের অভিশপ্ত জীবনকে ধিক্কার দেয়।

কিন্তু নিয়মিত তাকে রাজপ্রাসাদের কোন না কোন কর্মচারীর অঙ্কশায়িনী হতে হয়। আবার সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠে মঙ্গলা। যথাসময়ে ষষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো! পুত্রসন্তান!

রাজপুত্রের মত চেহারা। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। মঙ্গলার বুকের ভেতরটা শিরশির করে। যত সুন্দরই হোক, এই হতভাগাকেও দাসদের দলে ভিড়িয়ে দেবে! তার একমাত্র পরিচয় হবে 'দাসীপুত্র'। বড় হয়ে শুধু সে জানবে রাজবাড়ীরই কোন না কোন দাসীর গর্ভে আর কোন রাজানুচরের উন্মত্ত লালসায় তার জন্ম! না—এইবার—এইবার সে এসব কিছুই হতে দেবে না—

কয়েকদিন পর।

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি; রাজপ্রাসাদের দেউড়ীতে সশস্ত্র

প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল অন্তপুর থেকে। অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেমে এল রাস্তায়। তারপর দূরে আকাশের গায়ে আঁকা ভৈরব পাহাড়ের নীলাভ রেখা লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে হাঁটতে লাগল। ওই পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের ভেতরে চালাঘর বেঁধে সে তার বুকের মানিককে নিয়ে থাকবে। তাকে বড় করবে! সে তাকে 'মা' বলে ডাকবে—এসব ভাবতে ভাবতে তার বুকের শিরা উপশিরায় টান পড়ে। স্বপ্ন নেমে আসে চোখে—

মঙ্গলা তার বাচ্চা নিয়ে পালিয়েছে! সোরগোল পড়ে যায় দাসীদের মহলে। দেউড়ীতে পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠে। দিকে দিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে রাজার অনুচরেরা।

কোন দাসী একলা যেখানে খুশী পালিয়ে যেতে পারে কিন্তু তার পেটের ছেলে নিয়ে কখনো যেতে পারবে না—একটা ছেলে মানে একটা দাস। সেই দাস জন্ম দেবে আরো বহু দাসকে। একটা বীজের ভেতরে বনস্পতির সম্ভাবনা। অতএব যেমন করে হোক মঙ্গলার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে হবে—রাজার নির্দেশ—দেশের এই আইন, সমাজের এই নিয়ম!

বাচ্চাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে মঙ্গলা জোর পায়ে হাঁটছে। দুর্বল শরীর। মাথার ভেতরটা টলছে। অদূরে ভৈরব পাহাড়কে অতিকায় ঘাতকের মত মনে হয়।

ধপ—ধপ—ধপ—

পায়ের শব্দ! কেঁপে ওঠে মঙ্গলার বুকের ভেতরটা। নিশ্চয়ই রাজার লোক পিছু নিয়েছে। জোরে—জোরে—আরও দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সামনে চড়াই!

থামো—পালাতে চেষ্টা করো না—হেঁকে বলল একজন অনুচর। মঙ্গলার বুকটা হাফরের মত ওঠানামা করছে। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে! পাহাড়ের দুদিকে গভীর খাদ। সেখানে মৃত্যুর অন্ধকার। কোথাও পালানোর পথ নেই।

মঙ্গলা যখন দেখল আর উপায় নেই, তখন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। তার বুকের মাণিককে বুকে চেপে ধরল। তার ছোট্ট মুখখানায় চুমু খেয়ে আদর করে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্নাভরা গলায় বলল, পারলাম না বাবা—তোকে বাঁচাতে পারলাম না—

এই মাগী কি করছিস—কি করছিস তুই—রাজার লোকেরা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতে আসতেই মঙ্গলা বাচ্চাটাকে খাদের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিল—ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ মুহূর্তের জন্য একবার উঠেই মিলিয়ে গেল গভীর খাদের ঘন অন্ধকারে।

এইখানেই শেষ নয়।

দাসীপুত্র—রাজার অস্থাবর সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিকে ধ্বংস করার অপরাধে মঙ্গলাকে শূলে চড়ানো হলো·····এই পর্যন্ত লিখে থামল বৃদ্ধ অধ্যাপক আলবুকেরুথি। মঙ্গলার করুণ পরিণতির কথা ভেবে তার মন ভারী হয়ে উঠল।

বাঃ বাঃ—আজ তো অনেক লিখেছ দাদু? মার্থা কলকল করে বলল।

'ফ্ল্যাশব্যাকে'র কায়দায় লিখছি তো—বেশ কঠিন, নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল আলবুকেরুথি, আমাদের দেশের পুরাণে, প্রাচীন ইতিহাসের শ্লেভট্রেডের এত মেটিরিয়েল ছড়ানো রয়েছে—যে বুঝতে পারছি না—কোনটা রাখি—কোনটা বাদ দেই—, একটু থেমে আবার বলল, পুরাকালে গোটা সমাজটাই বাসুকীর মত মাথায় করে ধরে রাখতো শ্লেভরা। যে যুদ্ধ করতো তাকে বলা হতো দাসকপুত্র, যারা মাঠে কাজ করতো তাদের বলা হতো কামন্তাদাস। এই রকম রজকদাস, পেশকারদাস—আরও অনেক রকম দাসের অনেক কাহিনী আছে—সেসব বলতে গেলে কখনো লেখা শেষ হবে না—

মেয়েদের ভেতরেও বিভিন্ন ক্লাশ ছিল না?

ছিল না আবার, কুলদাসী, নটীদাসী, ভন্নাদাসী, কুম্ভদাসী, পুন্নাদাসী—আর একটু থেমে বলল, আর এক শ্রেণীর কথা তো তুই নিশ্চয়ই—

দেবদাসী,—না দাদু?

কিছু বলল না, তার মনে হল—নাতনীর সঙ্গে দেবদাসীদের নিয়ে কি আলোচনা করবে, কে না জানে, কুমারী অবস্থায় এদের দেবতার পায়ে উৎসর্গ করা হয়! আর কখনো কারো গলায় মালা দিতে পারে না। একদিকে এই বাধা নিষেধ, আর একদিকে যৌবনের দুর্নিবার জ্বালা। দুইয়ের টানা-পোড়েনে তারা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। আর তাদের এই দুর্বলতার গলিপথ দিয়ে ঢোকে পাপ। দেবতার মূর্তির আড়ালে বয়ে চলে ব্যভিচারের স্রোত। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই সেবাদাসীদের থেকেই পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা —গণিকাবৃত্তির উদ্ভব!

কি ভাবছ ?

কিছু না, আচ্ছা দিদি তুই ইবনবতুতার নাম শুনেছিস ?

বলছো কি দাদু, ফোর্টিন্থ সেঞ্চুরীর সবচেয়ে বড় পরিব্রাজকের নাম জানবো না ? তার বিখ্যাত বইয়ের নাম রেহলা অফ ইবনবতুতা—

রেহলা মানে কি বলতো ?

খনি—মানে মাইন—তুমি ভেবেছ আমি কিছু জানি না—না দাদু ?

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল আলবুকেরুথি—সত্যিই খনি—ইনফরমেশন অফ মাইনস, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের আর্থিক, সামাজিক অবস্থার রেকর্ড, মহম্মদ বিনতুঘলগের সময় সে ভারতে এসেছিল !—তুঘলগের আমলে ছিল দাসদাসীর ছড়াছড়ি—একটু থেমে উদ্দীপ্ত হয়ে নাতনীকে আবার বলতে শুরু করল, একদিন বতুতা দিল্লীর রাজপথ ধরে চলেছে। হঠাৎ শুনতে পেল, নাড়ানাকড়া আর ড্রামের শব্দ—তার সঙ্গে বাজছে ঝাঁঝর-ঝম-ঝম—

কি ব্যাপার, অভিজ্ঞতালোভী বিদেশী মানুষটি দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সুলতান শোভাযাত্রা করে আসছে। তার ডানদিকে আছে কাজীর দল। ঠিক তাদের সামনে মার্চ করে চলেছে বাছা বাছা সৈন্য। সুলতান আর কাজীর পরেই চলেছে বাজনদারের দল। তাদের পরনে বহুমূল্য ঝকঝকে রঙীন পোষাক। তারা উটের পিঠে চড়ে সোনার জরির ঝালর দেওয়া ড্রাম বাজাচ্ছে। আর তারপরেই একদল ঘোর কালো রঙের গাট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ—

এরাই বুঝি রয়্যাল শ্লেভ বাদশার খাসখানসামার দল না দাদু ?

হ্যাঁ—শুধু রাজকীয় শোভাযাত্রাতে নয় ইদুজ্জোহার উৎসবেও বতুতা দেখেছে দাসদাসীরা বহন করে নিয়ে চলেছে প্রভুদের নানারকমের ভোগসামগ্রী—

তুমি এত খুঁটিয়ে পড়েছ দাদু—

সবচেয়ে ইণ্টারেষ্টিং কি জানিস—রেহলার এক জায়গায় আছে Ibn Battuta was fond of music and liked to travel in the Company of Singers—

বতুতা গান ভালবাসতো ? গায়কগায়িকাদের সঙ্গ পছন্দ করতো ?

আরে হ্যাঁ—তবে আর বলছি কি সেই গানের নেশাতেই তো বতুতা এক অদ্ভুত দেবদাসীর ডেরায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। সে এক আশ্চর্য কাহিনী—

বলোনা—বলোনা দাদু—প্লী—জ,—প্লী—জ—

কোন কথা বলল না আলবুকেরুথি। কৌতূহলে জলে যেতে লাগল মার্থা। দাদুর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার শাস্ত গলায় বলল—তুমি তাহলে আমাকে বলবে না দাদু?

অচ্ছ্যুতি গলির নাম শুনেছিস?

অচ্ছ্যুতি গলি! মাথা ঝাঁকিয়ে মার্থা বলল, না তো—কোথায়?

তুই কখনও গোয়ার চৌহদ্দির বাইরে যাস নি—তুই জানবি কি করে?

ওসব কথা ছেড়ে তুমি কাহিনীটা বলো না দাদু?

তুই আমার এই নোটখাতাটা পড—

স্থান লক্ষ্ণৌ।

কাল ১৩৫১ খৃস্টাব্দ।

পাত্রী রোশেনারা বেগম।

ইমামবাড়ার পাশ দিয়ে সদতগঞ্জ ছাড়িয়ে আলমনগর এবং বাজপেয়ী মহল্লার ভেতর দিয়ে পুরানো লক্ষ্ণৌ শহরের দিকে যেতে যেতে আপনাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে ইট বের করা, নোনাধরা একটা মসজিদের সামনে। দেখবেন এই মসজিদের পাশ দিয়ে কালো কালো পাথরে বাঁধানো একটা সরু গলি সোজা চলে গেছে ক্যানেলের দিকে। আপনাকে আকর্ষণ করবে সেই গলির অদ্ভুত নাম—

অচ্ছ্যুতি গলি।

অচ্ছ্যুতি গলি অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের গলি। তাহলে কি অন্ত্যজ ও ব্রাত্য অর্থাৎ সমাজের নীচু তালার মানুষেরা এখানে থাকতো? আপনার কৌতূহল হবে। মনের ভেতরে হাজারো প্রশ্ন ঘনিয়ে আসবে!

আপনি কৌতূহলী হয়ে সেখানকার একালের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করলে কিছুই জানতে পারবেন না। তারাও আপনার মত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মাথা চুলকে বলবে অনেক কালের প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর। কত ভাঙ্গাগড়া হয়েছে—হয়তো এখানে একদিন ধাঙড়রাই থাকতো—

কিন্তু আপনি সেখানকার কোন বহুদর্শী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেই সে বলবে, আরে না-না অচ্ছ্যুত মানে অস্পৃশ্য নয়—

সেকালে দেবদাসীদের 'অচ্ছ্যুত' বলা হতো। এই গলির দুইদিকে দেবদাসীদের ছোট ছোট ঘর ছিল—

তারপরেই আপনাকে শোনাবে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী, যে কাহিনী এই অচ্ছ্যুতি গলির কালো পাথরে পাথরে শত শত বছর ধরে পরম মমতার মত জড়ানো রয়েছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এসেও আজও এই নোংরা অপরিসর রাজপথটি কোন এক দুর্ভাগিনী দেবদাসীর দুস্মৃতি বহন করছে।

ছয়শো বছর আগে কিন্তু এই অবখ্যাত অন্ধকার গলিটি ছিল শত শত পথিকের পদশব্দে মুখর। দুপাশে সুসজ্জিত বিপনী। সেখানে রাশি রাশি বিচিত্র পণ্য থরে থরে সাজানো থাকতো। সেদিন এখানকার বাতাসে ভাসতো সুখী আর স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল নরনারীর টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

কিন্তু যেই ধূপছায়ার মত সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতো, ঘরে ঘরে শাঁখের আওয়াজ উঠতো, তখন এই অচ্ছ্যুতি গলির চেহারাটাই যেত বদলে। সারি বেঁধে আসতো তেজী ঘোড়ায় টানা এক একটি সুসজ্জিত এক্কাগাড়ি। তার মাথায় থাকতো রঙীন ঝালর লাগানো চিত্র বিচিত্র চাঁদোয়া। তার নীচে চকচকে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখা যেত কোন ধনীনন্দনকে—যাদের বলা যায় রেইস আদমী।

রেইস আদমীর চেহারা যেমন হয়। ফুলো ফুলো গোলাপী রঙের গাল। নেশারক্ত দুটো ঢুলু ঢুলু চোখ। গায়ে লক্ষ্ণৌ চিকনের মিহি নক্সা তোলা চুড়িদার পাঞ্জাবী, ডান হাতে জড়ানো টাটকা বেল ফুলের মালা।

অচ্ছ্যুতি গলির ভেতরে আসার পর এক্কাগাড়ীর সেই মিছিল থেকে কিন্তু দুটি একটি করে গাড়ী কমতে শুরু করতো। অর্থাৎ বাবুরা যার যার নির্দিষ্ট রাত্রির অপ্সরীদের ঘরে অদৃশ্য হয়ে যেত। সেখানকার বাতাসে ভাসতো উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির অনুরণন।

অচ্ছুতি গলির পাশে সেই মসজিদটা ছিল কাজী শাহবুদ্দিনের মসজিদ। লোকে বলতো শাহজীর মসজিদ বা শাহজীর দরগা। এই দরগার পাশেই ছিল রোশেনারা বেগমের ঘর।

রোশেনারা।

তার ফরসা দীর্ঘ তন্বী দেহটাকে হঠাৎ দেখলে মনে হতো, যেন কোন ভাস্কর নিপুন হাতে হাতুড়ি বাটালী দিয়ে রচনা করেছে আশ্চর্য এক দেবীমূর্তি।

অচ্ছ্যাতি গলির ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল রোশেনারা! সন্ধ্যার পর তা ঘরের সামনে রেইস আদমীদের অর্থাৎ ধনী বিলাসীবাবুদের ভীড় লেগে যেত সেই নারীমাংসলোলুপ জনতাকে নিমন্ত্রিত করতো স্বয়ং শাহজী। সে গেরুয়ারঙের আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে থাকতো রোশেনারার দরজার গোড়ায়।

আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি ইসমাইলগঞ্জের শ্রেষ্ঠি উদয়াদিত্য—

আপনি?

আমি এসেছি গোমতী নদীর ওপার থেকে। আগন্তুক ক্লান্ত এবং করুণ গলায় বলল, আমি শুধু দর্শনপ্রার্থী—

শাহজী রঙীন সিল্কের কাপড়ে বাঁধাই করা একটা সুদৃশ্য খাতায় রোশেনারার দর্শনার্থীদের নাম ধাম লিখতে লিখতে তাদের বলল, শুনুন, আপনারা রোশেনারার সেলামী জানেন তো?

তারা মাথা ঝাঁকালো।

অচ্ছ্যাতি গলির সেরা সুন্দরী। নাচতে পারে। গাইতে পারে—

আপনি বলুন না শাহজী, যে কোন পরিমান অর্থ দিতে আমি প্রস্তুত—ইসমাইলগঞ্জের শ্রেষ্ঠী ব্যাকুল হয়ে বলল।

এক রাত্রির জন্য একহাজার দিনার তার মানে ১৭৫ গ্রেন রূপা দিয়ে তৈরী এক একটা টাকা—

উদয়াদিত্য ক্ষিপ্রহাতে তার স্বর্ণখচিত পেটিকায় হাত দিয়ে বলল, এখুনি অগ্রিম দিয়ে দেব এক সহস্র দিনার? গম্ভীর হয়ে হাত তুলে নিষেধ করল শাহজী। এইবার রোশেনারার আর এক দর্শনপ্রার্থীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো সে। মাথায় উষ্ণীষ। গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী। কোন এক দিন হয়তো তার রং ছিল সাদা। কিন্তু আজ মলিন হয়ে গেছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু অযত্নে আর অবহেলায় শ্রীহীন চেহারাটার ভেতরে সবচেয়ে আশ্চর্য তার দুটো চোখ। ভাসা ভাসা দুটো চোখে তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল দৃষ্টি। বেশীক্ষণ চোখের দিকে তাকানো যায় না! মনে হয় যেন একটা তীব্র লেলিহান অগ্নিশিখা লকলক করছে।

আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছেন?

কিছু না—কিছু না তো, কেমন থতমত খেয়ে যায় কাজী শাহবুদ্দিন। বিনীত হয়ে বলে, আপনার নিবাস?

দেওয়ানার আবার কোন নিবাস থাকে না কি? বেহেস্ত ছাড়া সারা দুনিয়াই আমার ঘর—

কিন্তু আপনি রোশেনারার কাছে—

বুঝতেই পারছেন, যে জন্য সবাই আসে সেজন্য আমি আসিনি—

তাহলে?

কারণটা আমি তাকেই বলবো!

চুপ করে গেল শাহজী। বুকের ভেতর থেকে অসহ্য—অসহ্য একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠে এল গলার কাছে। হিংস্র একটা বিদ্বেষে ছেয়ে গেল তার মন। থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট করে অভিশাপ উচ্চারণের মত করে বলল, রোশেনারা কে জানেন?

হ্যাঁ বিলক্ষণ জানি। এই মসজিদের নীচে আছে পীর আতাউল্ল্যার সমাধি। তার সমাধির ওপর আপনি এই মসজিদ তৈরী করেছেন। রোশেনারা বেগম হলো সেই পীরের অচ্ছ্যুতি!—

শাহজী ভিনদেশী সেই আগন্তুকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো—

রোশেনারা সম্বন্ধে এত কথা জানল কি করে! হয়তো রোশেনারার গাঁয়ের লোক। কিম্বা তার বিচিত্র জীবনের দীর্ঘ পথের বাঁকে বাঁকে যাদের সে ছেড়ে এসেছে লোকটা তাদেরই একজন—হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে উঠল। যতই শ্রীহীন হোক মানুষটা। বয়সে তরুণ! আর সে—

কি ভাবছেন, রোশেনারার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেবেন না?

না-না, দেব, তবে আজ নয়—সেই খাতা খুলল, মাথা ঝাঁকিয়ে থেমে থেমে বলল, আজ রোশেনারার কাছে আসছে, আজম মালিক বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া আর খান-ই জাহান বদরুদ্দিন।

আমার সম্বন্ধে কি বলছেন? অসহিষ্ণু হয়ে বলল উদয়াদিত্য। তার অস্তিত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিল শাহবুদ্দিন। তাড়াতাড়ি খাতার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, আপনি আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে আসুন—

খুশি হয়ে চলে গেল ইসমাইলগঞ্জের শ্রেষ্ঠী উদয়াদিত্য!

এবার আমাকে রোশেনারার সঙ্গে দেখা করতে দিন?

না। আপনি যেতে পারেন—আপনার সঙ্গে দেখা করবে না রোশেনারা—আমি বলছি—

কে আপনি? আপনার কি, এক্তিয়ার আছে তাকে বাধা দেওয়ার। আপনি যেমন আউলিয়া ফকির পীর আতাউল্লার সেবাইত তেমনি রোশেনারা।

হয়তো সেই উত্তপ্ত পরিবেশটা একেবারে প্রচণ্ড বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ত। কিন্তু জাফরি দেওয়া জানালার ওপার থেকে শোনা গেল মিষ্টি কণ্ঠস্বর—কে শাহজী—কার সঙ্গে কথা বলছেন?

ও কেউ না—তুমি ভেতরে যাও—বিড় বিড় করে বলল শাহজী, কোথা থেকে এসেছে একটা বেতমিজ লোক—

কিন্তু জানালা থেকে সরে গেল না রোশেনারা। সরে যেতে পারল না। তরুণ দেবদারুর মত দীর্ঘ চেহারার যুবকের মুখের দিকে তাকাতেই থর থর করে কেঁপে উঠল রোশেনারা। বিগত জীবন নয়, যেন পূর্বজন্মের হাজারো সুখস্মৃতি দুলে উঠল তার মনের ভেতরে। আর চেরাগ আলীর আকস্মিক উপস্থিতির ভেতরে সে যেন ক্ষীণ-আশার আলো দেখতে গেল।

সেদিন অবশ্য মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিল চেরাগ। কিন্তু আবার এসেছিল। এসেছিল একবার নয়। অনেক বার।

সে আসতো নিশি রাতের অন্ধকারে। আসতো ভোরের আবছায়া কুয়াশায় গা ঢেকে। আসতো নিঝুম ভরদুপুরে। আর সেই গোপন অভিসারের ফলেই যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়,—সে তো কামুক পশুগুলোর মত দেহজ আকর্ষণে তার কাছে আসতো না। না ব্যাপারটা—মোটেই গতানুগতিক নয়।

সেই তরুণ দরবেশ চেরাগ আলীশাহ আসতো তাকে প্রেমময় উদার সুফী ধর্মের কথা শোনাতে। কিন্তু দুনিয়ায় এত লোক থাকতে একটা ভ্রষ্ট মেয়ে মানুষের জন্য চেরাগের এত মাথা ব্যথা কেন? সে আর এক দীর্ঘ আর করুন ইতিহাস।

অচ্ছ্যুতি গলিতে হারমোনিয়ামের আর ঘুঙুরের শব্দে রাত নামে। প্রহরে প্রহরে কামার্ত্ত পশুদের বেলাল্লা হাসি আর চিৎকারে রাত বাড়ে। তারপরে নিদারুন অবসাদ আর ক্লান্তিতে সেই রাত ভোর হয়।

যত দিন যায় তত বেশি চেরাগ আলীর যাওয়া-আসা বাড়ে। ওদিকে পীর শাহবুদ্দিনের অত্যাচার বাড়তে থাকে। তার ব্যবহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর কঠোর হয়ে ওঠে। বলে, তুমি চেরাগ আলীকে আসতে নিষেধ করবে

পারো না—তীব্র আক্রোশ ভরা দৃষ্টিতে রোশেনারার দিকে তাকায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তুমি কিন্তু মোটেই ভাল করছো না—

সে তো আমাকে ছোঁয় না পর্যন্ত শাহজী। কবীর আর দাদুর পদ শোনায় —সুফী ধর্মের—

চুপ করো। তার কাছে যে সময়টা তুমি নষ্ট করছো তার দাম নেই?

মাথা নীচু করে রোশেনারা। একটা কথা বলে না। তার দেহকে পণ্য করে যে অর্থ রোজগার করে শাহজী তার পরিমাণ কম নয়।

তুমি জানো না, আমি প্রতিদিন কত লোককে ফিরিয়ে দেই—ফিরিয়ে দেই তোমার কষ্ট হবে বলে—বিড় বিড় করে অস্ফুট স্বরে বলে, আরে আমার কি, তোমার টাকা তো আর আমার নিজের স্বার্থে লাগে না, পীর পয়গম্বর শাহ আতাউল্লার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী এই মসজিদের রক্ষনাবেক্ষণ তার, মোনা-জাতের কাজেই লাগে।

রোশেনারা চোখের কোণা দিয়ে শাহজীর তেল চকচকে গোল মুখখানার দিকে তাকায়। সাবেক দিনের একটা ভয়ঙ্কর দুস্মৃতি মনের ঘোলাজলের ভেতর থেকে দুর্গন্ধে ভরা ভলভলে কাদার মত উঠে আসতে থাকে।

রাত নামে ঘন হয়ে। চারিদিকে নিষুতি হয়ে যায়। রোশেনারার ঘর থেকে আশ্লেষ তৃপ্ত এক একটি নাগর বিদায় নেয়। আর আমিষলোলুপ সেই মানুষগুলোর উন্মত্ত দাপাদাপিতে অবিন্যস্ত সেই শয্যার ওপর যখন রোশেনারা ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তখন আসে কাজী পীর শাহবুদ্দিন ওরফে শাহজী! এসেই রোশেনারার সেই একাধিক কামুক পশুর অত্যাচারে জর্জরিত, কান্না থরো থরো দেহটাকে কবুতরের পালকের মত বুকের ভেতরে তুলে নেয়। প্রচণ্ড জোরে তাকে নিস্পেষণ করতে করতে বলে, কেন —কেন কাঁদছো রোশেনারা, তুমি তো আল্লাহর নামে পবিত্র ইমানের কাজ করছো—

আমি আর পারছি না—আর পারছি না—আজ ছেড়ে দিন শাহজী—আল্লার কশম খেয়ে বলছি—

আর কথা বলতে পারে না রোশেনারা। কি করে বলবে? তার পাতলা ঠোঁট দুটোকে তখন গ্রাস করেছে শাহজীর অজগরের মত মুখগহ্বর! আর দুর্ভাগিনীর সেই ক্লান্ত হতচেতন দেহটা তখন আদিম লালসার উদ্দাম বন্যায় ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে গেছে।

সর্বসাক্ষী আকাশে ক্ষয়রোগীর মত পাণ্ডুর চাঁদ হাসে। ম্লান বিবর্ণ হাসি। আর বহু-বহুদূর থেকে একটা রাতজাগা পাখী কর্কশস্বরে ডেকেই কোথায় উধাও হয়ে যায়।

এ ঘটনা—পীর পয়গম্বর শাহ্ আতাউল্লার পবিত্র মসজিদের অন্দরমহলের প্রতিদিনের ঘটনা।

কিন্তু দিনের আলোয় শাহজীর আর এক চেহারা। ভক্তরা আসে। আসে দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে। তারা মসজিদের প্রশস্ত চাতালে বসে। শাহজী তাদের কাছে সুফী ধর্মের ব্যাখ্যা শোনায়—শোন সুফী শব্দের অর্থ জানিস? সুফী মানে পবিত্রতা—যিনি নিজের অস্তিত্বকে প্রেমময় আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিতে পারেন—তিনিই সুফী বা প্রেমিক—একটু থামে শাহজী। শ্রোতাদের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। চোখ দুটো আধ-বোজা করে হাসে। আবার বলে, আমাদের ধর্মটাই প্রেমের ধর্ম যে। যে প্রেমময় আল্লাহর প্রেমরসে ডুবে থাকে—তন্ময় হয়ে থাকে সে-ই সত্যিকারের সুফী—

শিষ্যরা মাথা ঝাঁকায়।

আড়ালে রোশেনারা জ্বলে যায়।

আল্লার অদৃশ্য উদার প্রেমময় মূর্তির পাশাপাশি গত রাত্রির কামার্ত পশুর বীভৎস চেহারাটা তার চোখে ভেসে ওঠে। ভাবে, কবে বাপজান ঋণ শোধ করতে পারবে আর এই পাপপুরী থেকে মুক্ত হবে সে। আকালের সময় তার বাপজান দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শাহজীর কাছে তাকে বাঁধা রেখেছিল। দুশোটা ঝকঝকে দিনার হাতে নিয়ে গামছার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, যাই মা—যত শীগগীর পারি—তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো—সেই যে গেছে। আর কখনো আসে নি—কে জানে বেঁচে আছে কি না! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। তবুও—

তবুও রোশেনারার অন্ধকার জীবনে রামধনুর ঝিলিমিলি ফোটে। মনের কোণে কোণে আশার আলো যেন উঁকি-ঝুঁকি দেয়। আরও বেশী উদীপ্ত হয়ে ওঠে চেরাগ আলীর কথাবার্তায়।

তোমার বাবা পেটের দায়ে যখন বন্ধক রেখেছিল তখন এইসব ব্যাভিচার তোমাকে করতে হবে—সে সর্ত তো ছিল না—

রোশেনারার মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে—তুমি যাকে ব্যাভিচার বলছো—

সেটা যে শাহজীর কাছে ধর্মচর্চার একটি অঙ্গ! দেখ না হিন্দুদের প্রত্যেক মন্দিরের দেবদাসীকেই আমার মত জীবন—তীব্র ব্যথায় তার গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে যায়। চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

চেরাগ আলী কথা বলে না। ভাবে পুরানো দিনের কথা, যখন গ্রামের পথে-প্রান্তরে গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় তাদের বাল্যপ্রেম একটা লতার মতই বেড়ে উঠেছিল যখন তাদের চোখে ছিল আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাজারো স্বপ্ন। কিন্তু কোথা থেকে এল দুর্ভিক্ষ—আর যেন কালবৈশাখীর ঝড়ের মত সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল।

তুমি চলে যাও—সে শিষ্যবাড়ি গেছে, এক্ষুনি ফিরে আসবে, আর তোমাকে দেখতে পেলে—

না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। অসহ্য অস্থিরতায় হাত দুটো নিসপিস করে উঠল চেরাগের।

কয়েক দিন পরই ঘটে গেল কাণ্ডটা। সেদিন ভর-দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল রোদ। আর যতদূর চোখ যায় ধুলোর প্রচণ্ড ঝড়ে দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। উত্তর ভারতবর্ষের এই আঁধি একবার শুরু হলে স্থায়ী হয় দীর্ঘক্ষণ।

সেই দারুন দুর্যোগ মাথায় করে শাহজী শিষ্যবাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখল, রোশেনারার ঘর হাট করে খোলা। রোশেনারা নেই!

রো—শে—না—রা। তার চীৎকারটা ঝোড়ো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল। শাহজী একটা টাঙ্গি হাতে করে ছুটল পাগলের মত।

সাঁ-সাঁ করে বাতাস বইছে। ধুলোর অন্ধকার পথ। কিন্তু কিছু দূর যেতেই শাহজীর নজরে পড়ল দূরে—বহু দূরে ঝাপসা দুটো ছায়াদেহ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধ আক্রোশে উন্মাদের মত ছুটল সেই দিকে।

তারপর—

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

সেই দুর্যোগের পটভূমিতে তিনটি নরনারীর জীবন যখন জটিল হয়ে উঠেছিল তখন প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল তা আজও অজ্ঞাত।

বেলা পড়ে এলে আঁধি থেমেছিল। অচ্ছ্যাতি গলির বাসিন্দারা দেখেছিল, খালের ধারে পড়ে আছে শাহজীর লাশ! গলাটা পুচিয়ে পুচিয়ে কাটা।

কাটা জায়গাটা হাঁ করে রয়েছে। সেখানে বড় বড় মাছি ভন ভন করছে। পাশেই তার সেই চকচকে ধারালো টাঙ্গিটা পড়ে রয়েছে।

কারো অনুমান চেরাগ আলী তাকে খুন করেছিল। আবার কারো ধারণা রোশেনারার দুঃখে সে নিজেই আত্মঘাতী হয়েছিল।

শত শত শতাব্দীর ব্যবধানে এসেও লক্ষ্ণৌ শহরের সেই অচ্ছ্যুতি গলি আজও সেই ভয়ঙ্কর দুস্মৃতিকে বহন করে চলেছে—

বাঃ অপূর্ব হয়েছে! এ কাহিনী কি বেলায় আছে? মার্থা বলল—কিন্তু মুসলমানদের ভেতরে দেবদাসীটা কি রকম—

জানি তোর খটকা লাগবে অনেক কিছুতে—শোন—রোশেনারার কথা কোথাও নেই তার ভ্রমণবৃত্তান্তে—তবে এই ধরণের দেবদাসীর কথা আছে—It is curious to note that certain sects of Muslims also started dedicating girls to their shrines. They were known as 'accuhutys' people enjoyed their company, dance and music much—.

রোশেনারার মত কোন অচ্ছ্যুতির সঙ্গে বতুতার পরিচয় হয়েছিল হয়তো—

কিন্তু এখানে সার্টেন সেক্টস অফ মুসলিম মানে কোন্ সম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছে দাদু—

আমার মনে হয় সুফীদের কথা বলেছে বতুতা। তখন তারা কুমারী মেয়েদের পীরের কাছে উৎসর্গ করতো। একটু থেমে আবার বলল, বৃদ্ধ অধ্যাপক। সুফীধর্মের সহজ উদার, রাজপথ ধরে এইসব পাপ ঢুকেছিল—আমাদের বৈষ্ণব ধর্মের নামে যেমন বহু ব্যাভিচার ঢুকে পড়েছে—সে চুপ করল। তাকে বড় ক্লান্ত মনে হল।

আজ আমি তোমার লেখার অনেক ক্ষতি করে দিলাম, না দাদু—

না-না—আলোচনারও দরকার আছে—এতবড একটা ভাস্ট সাবজেক্ট—

আমি যাই তোমার স্নানের জোগাড করি—অনেক বেলা হলো—মার্থা চলে গেল। তার আঁচল উড়িয়ে যাওয়া ক্ষিপ্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল আলবুকেরুথি। কত বয়স হলো ওর! তেইশ-চব্বিশ—নিজের মনের ভেতরে ডুব দিল। সাবেকদিনের স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল—কত মানুষ কত ঘটনা—সব—সব যেন মনের অন্ধকারে বাচ্চাদের ভাঙ্গা খেলনার মত

এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে—সেই বাইশ বছর আগে বোম্বে পোর্টে কাজ করার দিনগুলোর কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল গোয়ানীজ নাবিক পেড্রোর খসখসে কোনবহুল মুখখানা—লম্বা, চিত্রস্পার্টান—একটা ডায়েরী। মার্থা কি জানে—সে-ই তার এই স্লেভট্রেডের ওপর বই লেখার প্রেরণা?

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগীজরা চুটিয়ে দাস ব্যবসা করেছিল ভারতবর্ষে। হাজার হাজার এদেশী মেয়েপুরুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি করেছিল পর্তুগীজ জলদস্যুরা! কিন্তু কেমন করে—কি কারনে আটলান্টিকের ওপারের দূরদেশ পুর্তগালের নজর পড়েছিল দূর প্রাচ্যের সোনার দেশ ইণ্ডিয়ার দিকে? সে এক বিচিত্র কাহিনী—

১৪৮৪ সালের কোন একদিন।

পর্তুগালের রাজা ডম জোয়ানের রাজসভায় সেদিন চাঞ্চল্য জেগেছিল। উজীর, ওমরাহ, সেনাপতি, পারিষদ প্রত্যেকের মুখে এক কথা—দূরদেশের বিচিত্র এক আগন্তুক আসবে রাজসভায়। সে নাকি রাজার দর্শনপ্রার্থী—

কোথায় সেই বিদেশী অতিথি? ডম জোয়ান প্রধান সচিবকে জিজ্ঞাসা করল। সভায় উপস্থিত প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠল। প্রধান সচিব ইঙ্গিত করতেই প্রহরীরা নিয়ে এল কিম্ভুতকিমাকার একটা লোককে! সভায় গুঞ্জন উঠল, এ কি বনমানুষ—না গরিলা রে বাবা—এত কালো গায়ের রঙ হয়?

সত্যিই অদ্ভুত কদাকার সেই লোকটা। আলকাতরার মত কালো রঙ। মাথায় খুব ঘন কোঁকড়ানো চুল। যেমন পেশীবহুল মজবুত চেহারা তেমনি ঢ্যাঙ্গা। ওই চেহারার ওপরে পরেছে ঝলমলে চিত্রবিচিত্র রঙের পোষাক। কোমরে হাড়ের মালা। মাথায় পাখীর পালকের টুপি।

কে আপনি?

আমি উত্তর আফ্রিকার একটি দেশের কাফ্রীরাজা—

আপনার নাম?

বিনীনি, একটু থেমে ডম জোয়ানের লাল টকটকে মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল আপনার কাছে আমি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি মহারাজ—

নির্ভয়ে বলুন—

বিনীনি চোখ দুটো সরু করে কি যেন ভাবতে লাগল। থেমে থেমে বলল, দেখুন মহারাজ, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ সুদক্ষ নাবিক। আমিও বহুবার আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছি, একটু থামল, হঠাৎ ডম জোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, আমার বিশ্বাস, আমাদের মহাদেশ ঘুরে আটলান্টিক পেরিয়ে আরও—আরও পূবদিকে গেলে পাওয়া যাবে একটা নতুন দেশ—'ইণ্ডিয়া'। শুনেছি মহারাজ সেখানে পথেঘাটে তাল তাল সোনা পড়ে থাকে—

আপনি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু 'ইণ্ডিয়া'তে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি কেন?

বিনীনি মাথা চুলকায়। তার কালো মুখে লজ্জার ছায়া পড়ে। নিভু নিভু গলায় বলে, অজানা অচেনা পথ। এত বড় একটা সমুদ্র যাত্রার আয়োজন করবো—আমাদের সে সহায় সম্বল নেই মহারাজ—

সেই শুরু।

সেদিন থেকে ডম জোয়ানের একমাত্র চিন্তা হলো, কেমন করে—কোনদিক দিয়ে গেলে 'ইণ্ডিয়া'র পথ পাওয়া যাবে!

সুদীর্ঘ তের বছর ধরে বহু লোকক্ষয় আর ব্যর্থতার পর সোনার দেশ ইণ্ডিয়ার সমুদ্র পথের হদিশ পেয়েছিল ভাস্কো-ডি-গামা—সে ইতিহাস কারো অজানা নয়।

তারপর—

শুধু আরবসাগর নয়, ভারত মহাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগর নয়,—ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচ্যের সমস্ত সমুদ্রে পর্তুগীজরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল, বিদেশী সামুদ্রিক বানিজ্যে তাদের ছিল একচেটিয়া অধিকার!

ব্যবসার পরে উপনিবেশ স্থাপন। উপনিবেশের পর পররাজ্যলোলুপতা। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাস যা এখানেও তাই। কোন তফাৎ নেই। নেই এতটুকু ব্যতিক্রম!

গোয়া।

দমন।

দিউ!

এই তিনটি জনপদ দখল করেছিল পর্তুগীজরা। দখল করেছিল সিংহল। লোহিতসাগরের জলে তারাই প্রভুত্ব করতো! পারস্য উপসাগরের তীরে অরমাজ (Ormuz) থেকে সুদূর প্রাচ্যের মাল্লাক্কা পর্যন্ত ছিল তাদের অবাধ আনাগোনা।

কিন্তু ইংরাজদের মত রাজ্য পরিচালনার দিকে তাদের এতটুকু লক্ষ্য ছিল না! শুধু লক্ষ্য ছিল তাদের জ্যান্ত মানুষের ব্যবসার দিকে! তাদের হিংস্র শকুনী দৃষ্টি শুধু উৎসুক হয়ে খুঁজে বেড়াতো যুবতী নারী আর শক্তসমর্থ পুরুষেরদল। যত সুন্দর সুগঠিত চেহারা হবে মেয়ে-পুরুষদের তত বেশী দামে বিকোবে।

কিন্তু পর্তুগীজ বোম্বেটের নারীধর্ষন, নির্বিচারে লুঠতরাজ খুনজখমের সেই শ্বাসরোধী ইতিহাস এখন থাক। আরম্ভেরও একটা আরম্ভ থাকে—

ডম জোয়ানের কানে পড়েছিল 'ইণ্ডিয়া' শুধু 'সোনার দেশ' নয়—মানুষ কেনা-বেচা ব্যবসার খুব বড় মার্কেট! আরব বণিকরা, মুররা নাকি চুটিয়ে এই ব্যবসা করে—আরও শুনেছিল স্লেভগুলোকে যত খুশী এবং যতক্ষণ খুশী চাবুক মেরে খাটিয়ে নেওয়া যায়—আর ওই হতভাগাগুলো যে কোন কাজ জানে। তাই 'ইণ্ডিয়া'গামী তার নাবিকদের সে বলতো, ওহে, শুনছো—ভিন্ন ভাষাভাষী কিছু স্লেভ কিনে নিও, তোমাদের বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রায় ওরা অনেক সাহায্য করতে পারবে—কিন্তু—

তার নাবিকেরা স্লেভ কিনবে কি 'ইণ্ডিয়া'তে যাওয়ার পথই খুঁজে পায় না। অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোন নিরুদ্দেশে শূন্যে উধাও হয়ে যায়—

পর্তুগীজদের ভারত অভিযানের সেই—সুদূর অতীতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলে—কি দেখা যায়? সেখানে কি এই নারীমাংসলোলুপ হিংস্র, জলদস্যুদের কোন অস্তিত্ব ছিল—ছিল কি নিষ্ঠুর, নৃশংস হার্মাদদের দল?

না।

শত শত বছরের ব্যবধান এড়িয়ে সেই সুদূরকালের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিলে দেখা যাবে, একটি মাত্র—একটা পালতোলা জাহাজ এগিয়ে

আসছে। আসছে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে! কোন ইঞ্জিন নেই; মেশিন নেই। শুধু মাল্লাদের হাতের শক্ত শক্ত পেশীর ওপরে ভরসা। আর ভরসা অধিনায়কের দূরদর্শিতা ও সাহসের ওপরে।

বার্থোলোমিউ ডিয়াজ।

সোনার দেশ ভারতবর্ষের প্রথম পর্তুগীজ পথপ্রদর্শক ভাস্কো—ডি—গামার মত নামটা বহুল পরিচিত নয়। কোন ইতিহাসের পাতায় নেই এই দুঃসাহসিক অভিযানের নির্ভীক অধিনায়ক বার্থোলোমিউয়ের নাম।

কিন্তু থাকতে পারতো তাঁর নাম। ভাস্কো—ডি—গা—মা—র মত তাঁর নামটাও পৃথিবীর ইতিহাসে সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করতে পারতো। কিন্তু সে সৌভাগ্য বার্থোলোমিউইয়ের ছিল না।

কারণ দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ঠিক যখন উত্তমাশা অন্তরীপের কাছাকাছি এসেছিল তার জাহাজ, তখুনি প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছিলেন বার্থোলোমিউ। ঝড়ো বাতাসে অকূল সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেললেন তিনি। বিশাল সমুদ্রের কোন দিগন্তে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন—তা কেউ জানে না।

তিনি হারিয়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল তার ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের দুর্বাসনা।

এসব ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

আবার ডম জোয়ান ভারত অভিযানের তোড়জোড় শুরু করলো। বহু মেহনত করে তিনটি ছোট ছোট জাহাজ তৈরী করা হলো। তাদের যে কোন একটার পার্টস ভেঙ্গে গেলে অন্য আর একটায় অনায়াসেই লাগিয়ে দেওয়া যায়! জাহাজ তৈরীর পর খুঁজে-পেতে বের করা হলো দুঃসাহসিক অভিযানের অধিনায়ক ভাস্কোকে। বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ চেহারা! বড় বড় দুটো চোখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি। সে রাজার হাতে চুমু খেয়ে বলেছিল, আপনি যে মহৎ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছেন—আশা করি তাতে আমি কৃতকার্য হবো—ঈশ্বর আমার সহায় হবেন—

কিন্তু নৃশংসতা আর ক্রূরতায় যার জুড়ি মেলা ভার, এমন একজন ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের সর্দারকে কি কখনো ভগবান ক্ষমা করতে পারেন! যাক সে সব কথা—

ভাস্কো 'সেণ্ট গ্র্যাবিয়েল' নামে জাহাজে চড়ে (এই জাহাজের পাইলট ছিল পিটার অ্যালেন কুইয়ার) ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে অভিযান শুরু করল।

বার্থোলোমিউ এবং ভাস্কো—ডি—গামার মনে শুধু আবিষ্কারের নেশা ছিল। ছিল নতুন দেশের পথের নিশানা বের করার উন্মাদনা!

কিন্তু—

লিসবন থেকে বেরিয়ে বিশাল ভয়ঙ্কর আটলাণ্টিকে এসে ভাস্কো দেখল—দেখল জিব্রল্টারে, মাদ্রিদে আরও বন্দরে বন্দরে বিচিত্র এক দৃশ্য! উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমানরা অর্থাৎ মুররা, আরবের সওদাগররা বড় বড় ছিপ নৌকোতে করে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ নিয়ে চলেছে দেশ দেশান্তরে। ভাস্কোর গ্যাব্রিয়েল জাহাজের অধিনায়ক পিটার চীৎকার করে বলল, এত মানুষ নিয়ে কোথায় চলেছ হে—

এরাই তো আমাদের কমোডিটি!—আমাদের সওদা, এরা স্লেভ! সাগরের হু-হু হাওয়ায় পানসী থেকে কথাগুলো ভেসে এল। ভাস্কোর মনে হল, রাজা স্লেভ কিনতে বলেছিল। সে খোঁজখবর নিয়ে জানল, মুররা আর আরবের ব্যাপারীরা স্মরণাতীতকাল থেকে এই দাসব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে—সমুদ্রো-পকূলের দেশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মেয়ে-পুরুষ লুটে নিয়ে এসে বন্দরে বিক্রি করলেই অনেক—অনেক টাকা! ভাস্কোর চোখদুটো লোভের আশায় দগদগে ঘায়ের মত জ্বলে উঠল। আরও জানল—এই দীর্ঘ ছিপ নৌকোকে বলে 'ধোজ' Dhows কিম্বা 'বুগ্যালোজ' Buggalows ; 'বুগ্যালোজ' বললেই বুঝতে হবে দাসদাসী চোরাই করা নৌকো। আর এই জীবন্তপশুদের বোঝাই করারও কোন ঝামেলা নেই। নৌকোর খোলের ভেতরে ফেলে রাখলেই হলো। খেতেটেতে দেওয়ার কোন বালাই নেই। মরে গেলে লাশ টেনে সমুদ্রের জলে ফেলে দাও—ল্যাঠা চুকে গেল! পর্তুগীজ অধিনায়ক ভাস্কোর মনের ভেতরে সেই থেকে সংকল্প বাসা বাঁধল—চুটিয়ে এই দাসব্যবসা করতে হবে—

তারা পৌছল জিব্রল্টারে। এখানে এসে জানল, অন্যান্য ব্যবসার মত স্লেভ-সিজন—দাসব্যবসারও একটা মরশুম আছে। মিশরের সুলতান ১লা জানুয়ারী থেকে ১লা মে পর্যন্ত তার দেশের উপকূল দিয়ে স্লেভের নৌকো যেতে দিতেন না—তখন সমুদ্র থাকে খুব রাফ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। যাহোক, অনেক কষ্ট আর অনেক অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে দুস্তর আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে ভাস্কো পৌছালো জাঞ্জিবারে।

জাঞ্জিবার তখন আরব রাজ্যের রাজধানী। পূর্ব আফ্রিকার সমৃদ্ধিশালী

ব্যবসাকেন্দ্র। ভাস্কো দেখল, সবচেয়ে বড় স্লেভমার্কেট জাঞ্জিবারে। ব্যাপারীরা সমুদ্রের ধারে বালুচরে ছোট ছোট ছাউনি করে কুকুর শেয়ালের মত গাদা করে রেখেছে দাসদাসীর দল।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী স্লেভের আড়ৎ। এই জাঞ্জিবার থেকে বছরে দশ হাজার থেকে বিশ হাজার স্লেভ রপ্তানী হয় দূরপ্রাচ্যে অর্থাৎ ইণ্ডিয়ায়। আর আরব জলদস্যুরা ইণ্ডিয়া থেকে যাদের লুঠ করে নিয়ে আসে, তাদের বিক্রি করে জাঞ্জিবারের এই দাসদাসীর হাটে। ভাস্কোর মনে হল—

জাঞ্জিবার হ'ল—কাল মানুষের রক্ত স্রোত বেরিয়ে ইণ্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়ার আর ইণ্ডিয়া থেকে খাঁটি আর্যরক্ত আসার স্লুইজ গেট।

জাঞ্জিবার থেকে ভাস্কো এল ইণ্ডিয়ায়। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই সে দেখল,—এই দেশের আদিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের সীমায় সীমায় আচ্ছন্ন বিপুল শস্যসম্ভার; দেখল, মঠে মন্দিরে সোনার তৈরী দেবদেবী মূর্তি! বড় বড় নগরের বৃক্ষ শোভিত রাজপথের দুধারে সুদৃশ্য বিপণীশ্রেণীর থাকে থাকে সাজানো বহুমূল্য অলঙ্কার! আর—

আর দেখল তন্বী সুঠাম, অপরূপ সুন্দরী নারীর দল। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীদের রক্তে 'আগুন ধরে গেল। সুরু হলো গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ। অগ্নিসংযোগ।

তখনকার এক প্রত্যক্ষদর্শী পরিব্রাজকের বিবরণে আছে পর্তুগীজ জল-দস্যুদের বীভৎস অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা—

They (Portugese pirates) Plundered the Golden part of the land (Bengal), mostly situated by the sea-shore. With canons, guns and other deadly weapons in the later Period of 15th Century. The villagers were quite helpless to cope with these notorious sea pirates······

অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের কূলে বঙ্গদেশের স্বর্ণপ্রসূ অঞ্চলে এসে পর্তুগীজ জলদস্যুরা লুটতরাজ করতো। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তারা কামান বন্দুক এবং অন্যান্য মারণাস্ত্র নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করতো। এই দুর্দান্ত নৃশংস অত্যাচারী জলদস্যুদের কাছে সাধারণ গ্রামবাসীরা নিতান্ত অসহায় ছিল—

তারপরে ?

তারপর ধৃত অসহায় বন্দীদের নিয়ে শুরু করতো অকথ্য অত্যাচার। প্রথমতঃ যতগুলো মেয়ে-পুরুষকে পারতো বন্দী করে জাহাজে নিয়ে আসতো। তাদের প্রত্যেকের নাম ঠিকানা খাতায় লিখতো! দূর দূর গ্রামে বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে বলতো—যদি প্রচুর টাকা দাও—তাহলে তোমার লোককে আমরা ছেড়ে দেব—

টাকা দিতে পারলে ছেড়ে দিত। আর যারা দরিদ্র, যাদের আত্মীয় স্বজনরা টাকা দিতে পারতো না, তাদের আরাকানে কিম্বা আরও কোন দূরদেশে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত।

কিন্তু জাহাজেই বন্দীদের বেশীর ভাগই ভবলীলা সাঙ্গ করতো। অনেকে তাদের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার সহ্য করতো না।

অত্যাচার। নৃশংস, অমানুষিক অত্যাচার। তারও বিবরণ আছে ইতিহাসে। মেয়ে-পুরুষদের সব একসঙ্গে জাহাজের ডেকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিত।—

এইবার রড নিয়ে এস—দস্যু অধিনায়ক হুকুম করতো। আগুনে গনগনে লাল এবং সূচলো একটা লোহার রড নিয়ে আসতো কোন সহকারী। প্রত্যেক বন্দীদের ডান হাতের তালুতে ঠিক এক ইঞ্চি পরিমাণ ফুটো করতো সেই তপ্ত রড দিয়ে। তারপরে হাতের সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দড়ি পরিয়ে পরিয়ে সমস্ত বন্দীদের সারি সারি বেঁধে রাখতো! কোনভাবেই যেন পালাতে না পারে—তারই জন্য এই অমানুষিক এবং অভিনব উপায়!

বন্দীদের খাওয়ার ব্যবস্থা। তাও অদ্ভুত। শত শত বন্দীদের ভেতরে মাত্র কয়েক সের চাল ছুঁড়ে দেওয়া হতো। দিনের পর দিন অনাহারে থাকা ক্ষুধার্ত বন্দীরা সেই চালটুকু কাড়াকাড়ি করে নিত। কারো কপালে কয়েকটা দানা জুটতো—কারো কপালে তাও জুটতো না। যাদের জুটতো—তারা কয়েকটা দানা চাল মুখে ফেলে দিয়ে জিভ দিয়ে চুষে চুষে খেত।

অতএব বেশীরভাগই মারা যেত। ক্ষিদের জ্বালা, হাতে সেই ঘায়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতো না। সেই ছিদ্রের চারিদিক পচে উঠতো। তাদের সারা শরীর একেবারে বিষিয়ে যেত। তারপরে এক সময় শুধু 'জল জল' বলে চিৎকার করে তারা মারা যেত। সেই অসহায় বন্দীর মৃতদেহ কুকুর শেয়ালের মত সাগরের জলে ছুঁড়ে দিত।

আর যারা বেঁচে থাকতো তাদের কারো কারো দুটো হাত কেটে দিত।

শুধু কাটার আনন্দেই কাটতো। কারো কারো পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নিত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতো। তখন বোম্বেটেরা হি হি করে হেসে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তো। কখনো কখনো আবার শঙ্করমাছের চামড়ার চাবুক দিয়ে মারতো। এক এক আঘাতে এক খাবলা করে পিঠের চামড়া উঠে আসতো।

নারী বন্দিনীরা!

তাদের ভেতরে যারা বুড়ীথুড়ী তাদের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত, অঙ্গভঙ্গী করতো। আর সুন্দরী যুবতী মেয়েগুলো নিয়ে লোফালুফি শুরু হয়ে যেত। যখন খুশী—যতবার খুশী তাদের এক একজনকে নিয়ে কেবিনে ঢুকতো। কিম্বা সকলের সামনেই জন্তু জানোয়ারের মত বলাৎকার করতো! অনেক—অনেক জলদস্যু মনে করতো—এই জলপথ, এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা যদি অফুরাণ হতো—তাহলে মেয়েগুলোকে বেশ উপভোগ করতে করতে যাওয়া যেত।

কেন না—বন্দরে পৌছুলেই তো অধিনায়ক এদের চড়া দামে দাস ব্যবসায়ী ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করে দেবে। ··অত্যাচারী হার্মাদদের জন্যেই সোনার বাংলার নদীয়া, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম—সমুদ্র উপকূলের আরও অনেক জেলা একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি আলওয়াল তার 'পদ্মাবতী' কাব্য গ্রন্থে বলেছেন পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচারের কথা—হার্মাদরা ছিল ভয়ঙ্কর রক্ত-পিপাসু এক অমানবিক দৈত্য বিশেষ। বিষধর সাপের চেয়েও হিংস্র ছিল এরা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কবি আলওয়াল নিজেই ফিরিঙ্গী দস্যুদের হাতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তাকে পিঠ মোড়া দিয়ে বেঁধে তার হাত লোহার রড দিয়ে ফুটো করতে গেলে গ্রামবাসীরা দস্যুদের বাধা দেয়। সেই সংঘর্ষে তার পিতৃদেব নিহত হন আর কবি দূরে জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

তাই আমরা শত শতাব্দীর ব্যবধানে এসেও 'পদ্মাবতী' কাব্যের মাধ্যমে জানতে পারি পর্তুগীজ জলদস্যুর সেই নৃশংস অত্যাচারের ইতিবৃত্ত··

এই পর্যন্ত পড়ে থামল আলবুকেরুখি। 'ভাস্কোর' চ্যাপ্টারটা কয়েকদিন একটানা পরিশ্রম করে লিখেছে—সেটা রিভাইস করছে—কিন্তু তারপর আর পড়তে পারল না। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। তার চোখের সামনে যেন এক একটা প্রেতের মত এসে দাঁড়ালো লালমুখো দাসব্যবসায়ীর দল। লক্ষ লক্ষ নরনারীর উতরোল কান্না যেন তার কানের কাছে বাজতে

শুরু করল। বুকের ভেতরটা ভারী—খুব ভারী হয়ে উঠল। আর অনেকদূর অগ্রসর হয়ে এসেও এত বড় একটা কাজ হাতে দেওয়ার জন্য তার আজ ভয় করতে লাগল। ডুবন্ত মানুষ যেমন ডাঙ্গার দিকে আকুল আগ্রহে তাকায় ঠিক তেমনি—তেমনি করে সে অদূরে স্লেভট্রেড সংক্রান্ত রাশি রাশি বই, পুরানো গেজেট পুরানো ডেলীপেপারে ঠাসা বিশাল হোয়াটনটটার দিকে তাকালো—

মাঝখানের সেলফে বইয়ের আড়ালে মোটা খাতার দিকে নজর পড়তেই তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল! খাতাটার রঙ কোন এককালে হয়তো লাল ছিল—এখন কেমন বিবর্ণ ও মলিন হয়ে গেছে। বোম্বে পোর্টে কাজ করার সময় সে ওটা পেয়েছিল একজনের কাছে থেকে। তেইশ বছর আগে সে ওর ভেতরের লেখাগুলো পড়ে চমকে উঠেছিল—সেই তখন থেকে স্লেভট্রেডের ওপর বই লেখার বাসনাটা একটা অবুঝ দৈত্যের মত তার কাঁধে চেপে বসেছিল। তাকে নামাতে পারেনি। রিটায়ার করার পর ওই বইগুলো আর ওই খাতাটা সম্বল করে কাজ হাতে দিয়েছিল। কিন্তু—

এখন দেখছে এরকম দুর্বাসনা না করাই ভাল ছিল। দীর্ঘ তিন তিনটি শতাব্দী ব্যাপী যারা ভারত মহাসাগরে প্রভুত্ব করেছে, যারা বঙ্গোপসাগর থেকে সুদূর আরব সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করেছে, কত উৎপীড়ন, কত অত্যাচারের মর্মন্তুদ ইতিবৃত্তে যে ইতিহাস কণ্টকাকীর্ণ—সে ইতিহাস লেখা খুবই কষ্টসাধ্য।

সেলফ থেকে একটা বই টেনে নিল। কিন্তু উপায় তো নেই, লিখতেই হবে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের ইতিহাস। তাহলে দস্যুবৃত্তির ইতিহাসের সঙ্গে দাসব্যবসার ইতিহাসের একেবারে বুঝি অচ্ছেদ্য যোগাযোগ।

একটু পরেই বইটির ভেতরে একেবারে ডুবে গেল আলবুকেরুথি। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় এক বলিষ্ঠ পর্তুগীজ নাবিকের ছবি। তার বড় বড় দুচোখে ধু ধু করে জলছে জিঘাংসা। হাতে তীক্ষ্ণধার খাপখোলা তলোয়ার। দৃঢ় এবং দৃপ্ত পদক্ষেপ। তার নীচে 'ক্যাপশান' আছে ভাস্কো-ডি-গামা! আলবুকেরুথির মনে হল, লিসবন থেকে ত্রিশমাইল দূরে আটলান্টিকের তীরে ভাস্কোর বসতবাটীর ভিটেতেও আছে একটা স্মৃতিস্তম্ভ! তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে এই কথাগুলো—'দুর্গম পথের যাত্রী'—ঈশ্বর তার সহায় ছিলেন—মনে

মনে হাসল আলবুকেরুথি—ঈশ্বর। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ যে নিজের হাতে খুন করেছে; পৈশাচিক নিষ্ঠুরতাই ছিল যার একমাত্র আনন্দ তার সহায় কি সত্যিই ঈশ্বর ছিল—থাকতে পারে?

তারপর পাতার পর পাতা শুধু পর্তুগীজ জলদস্যুদের রোমহর্ষক অত্যাচারের বিবরণ। হতভাগ্য এক ক্রেভের ওপরে নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিবরণ পড়ে শিউরে উঠল সে। বিচিত্র সে ঘটনা—

গভীর হয়ে রাত্রি নেমেছে দিগন্তবিস্তারিত সমুদ্রে। যতদূর চোখ যায় স্থির নিস্পন্দ সমুদ্র যেন গভীর কালো রঙের পাত দিয়ে মোড়া। সেই বিশ্বচরাচরময় নিবিড় অন্ধকারের ভেতরে একটি তীব্র আলোর রেখা প্রসারিত হয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে।

একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে। আসছে খুব দ্রুত—আসছে মক্কা থেকে। সাতটি মাস্তলের বিশাল জাহাজ। পাঁচটি সাদা পালে লেগেছে সমুদ্রের হু হু বাতাস। ফুলে উঠেছে পাল।

আমরা কি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল দিয়ে যাচ্ছি? হ্যাঁ জাঁহাপনা, ওই তো দূরে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

জাহাজের চারশো মেয়েপুরুষ আরোহীর অধিনায়ক এবং মিশরের সুলতানের দূত জাভার বেগের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া নামল। গুজরাট থেকে শুরু করে কালিকট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আরব সমুদ্রের দিকে দিকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের জাহাজ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। নরখাদক হিংস্র দস্যুদের কটা চোখে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি শুধু আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় কোথায় পণ্যবাহী ভারতীয় জাহাজ, ভারতীয় জাহাজ কোথায়—সালঙ্করা রূপসী আরোহীবাহী ময়ূরপঙ্খী বজরা, ভয়ে দুরু দুরু কেঁপে উঠল জাভার বেগের বুক। সে জানে—

জলদস্যুদের কাজও নিখুঁত। শুধু যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অর্ণবপোত নিয়ে তারা ডাকাতি করে তা, নয়। দূর পাল্লার বন্দুকধারী জনকয়েক মাল্লা নিয়ে এক একটি তীব্র গতি পানসী সমুদ্রের এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়ায়। লক্ষ্য করো দূরে কোথাও বকের ডানার মত সাদা ধবধবে জাহাজের পাল কি দেখা যাচ্ছে।

আবার কখনও কখনও অত্যন্ত নিরীহ এবং হাবাগোবা বিদেশী বণিকের ছদ্মবেশে বন্দরে বন্দরে পানসী নোঙর করে। দিন কয়েক সেখানকার দেশীয় সওদাগর এবং বন্দরে অপেক্ষারত জাহাজের মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে

মেলামেশা ক'রে খবর জেনে নেয়, কবে কোথা থেকে কোন জাহাজ এসে বন্দরে পৌছাবে।

খবর সংগ্রহ করা হলেই বিদেশী বণিকদের ছিপ নৌকো রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর ঠিক খবর অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় কামান বন্দুক দিয়ে সাজানো পর্তুগীজ রণতরী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কামান বন্দুক বাইরের থেকে দেখা যায় না। শুধু চাল চিনি আর ভারতীয় সুতোর বস্তা বাইরে ডেকের ওপরে থরে থরে সাজানো থাকে। দেখে মনে হয় সামান্য কিছু রুজি রোজগারের আশায় দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে কোন শ্বেতাঙ্গ বণিকের বাণিজ্যতরী।

আর প্রতীক্ষারত এই জাহাজকে কেন্দ্র করে দূরে দূরে বিভিন্ন খাল কি খাড়ির ভেতরে লুকিয়ে থাকে তাদের ছিপ নৌকো। নৌকোর প্রত্যেকটি মাল্লা যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা তেমনি সুদক্ষ নাবিক। তারা চুপ করে পানসী নিয়ে বসে থাকে। বসে থাকে দূরের ওই বড় জাহাজ থেকে একটা নীল আলোর সঙ্কেতের অপেক্ষায়! সঙ্কেত এলেই চারিদিক থেকে পানসীগুলো তীরবেগে ছুটে যাবে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল সেই জাহাজের দিকে।

এই জাহাজ থামাও—হুঙ্কার আসবে ডাকাতের নৌকো থেকে।

থেমে যাবে জাহাজ। আরোহীরা আর্তনাদ করে উঠবে—সর্বনাশ বোম্বেটেরা ধরেছে জাহাজ—মেয়েপুরুষের আর্ত কলরবে সমুদ্রের অশ্রান্ত সেই তীব্র গর্জন পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যাবে। কোন কোন জাহাজে যদি কিছু গোলা বারুদ এবং বন্দুক থাকে তাহলে আত্মরক্ষার জন্য অতি ক্ষীণ চেষ্টা করে।

কিন্তু ততক্ষণে বোম্বেটেদের সর্দারের বড় রণতরী গুটি গুটি চলে আসবে। সুরু হয়ে যাবে সুসংবদ্ধ এবং অবিশ্রান্ত আক্রমণ। নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা দিয়ে ঝলসে উঠবে শত শত বন্দুক। পর্তুগালে তৈরী উন্নত ধরণের কামান থেকে ছুটে আসবে মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষী গোলা। তারপরে সেই হঠাৎ আক্রমণে বিধ্বস্ত জাহাজে উঠে আসবে বোম্বেটেরা; শুরু করবে নির্বিচারে লুণ্ঠন আর নৃশংস অত্যাচার! জাভার বেগের স্মৃতির ভেতরে ভেসে উঠল বোম্বেটেদের একটি রোমহর্ষক ডাকাতির ইতিবৃত্ত।

একবার পণ্যবাহী চব্বিশটি নৌকোর এক নৌবহর আসছিল কালিকটের দিকে। কালিকটের রাজা জোমোরিনের নৌহবহর। প্রত্যেকটি নৌকোয় ছিল ঠাসা চালের বস্তা।

এই নৌবহরের দিকে বোম্বেটেদের প্রধান ভাস্কো-ডি-গামার শ্যেন দৃষ্টি পড়ল। চব্বিশটি নৌকোয় মোট চারশো মাল্লা ছিল। রাজকীয় নৌবহর। অতএব অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বেশী এবং অনেক শক্তিশালী অস্ত্র এবং গোলাবারুদ ছিল ভাস্কোর। অতএব চব্বিশটি নৌকোর চারশো মাল্লা বিনা যুদ্ধে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করল।

শোন, প্রত্যেকটি ভারতীয় নাবিকের মাথা, কান এবং নাক কেটে নিয়ে এসে', ভাস্কো হুকুম করল তার অধীনস্থ বোম্বেটেদের।

এই আদেশ—ঠিক এই নির্দেশটিরই প্রতীক্ষা করছিল রক্তপিপাসু দস্যুরা। তারা দল বেঁধে কালিকটের নৌকোয় উঠে এল। তাদের হাতে ধারালো ছুরি। এক একটা নাবিককে ধরে ধরে নাক, কান আর মাথা কাটতে লাগল।

আমি চারশো মাথা, চারশো নাক, চারশো কান চাই, ভাস্কোর রক্তচোখে নিষ্ঠুর হত্যার অনুপ্রেরণা ঝকমক করছে।

মেরো না—মেরো না—দয়া করে আমাদের প্রাণে মেরো না, মাঝিদের তীব্র আর্তনাদের সেই মর্মন্তুদ শব্দে সমুদ্রের বিশাল জলরাশিও যেন আড়ষ্ট ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আমি রাজপুরোহিত, অসমসাহসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছোট একটা ডিঙ্গি করে চলে এল—চলে এল একেবারে সেই নরখাদক দস্যুসর্দার ভাস্কোর বোটে।

কি চাই তোমার এখানে?

সাহেব, আমি আমাদের মহারাজা জেমোরিনের দূত হয়ে এসেছি।

বেশ, বলো—কি বলেছে তোমাদের মহারাজ? ভাস্কোর চোখে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝিকমিক করেছে।

তোমার যত টাকা লাগে, যত সোনা তুমি চাও—তোমাকে দেওয়া হবে, অনুগ্রহ করে তুমি আমাদের লোকদের প্রাণে মেরো না—

ভাস্কো কোন কথা বলল না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সরল নিষ্পাপ মুখখানার দিকে। রাজদূতের মত পোষাক পরিচ্ছদ নয়—অতি সাধারণ একটি শ্বেতশুভ্র উত্তরীয় তার গায়ে, পরণে হাঁটু পর্যন্ত লালপেড়ে একটি ধুতি।

তুমি বসো—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ব্রাহ্মণ।

খুব সমাদর করে তাকে বসানো হলো। ক্ষীণ আশার সঞ্চার হলো ব্রাহ্মণের মনে।

ভাস্কো একটুক্ষণ কি ভেবে চলে গেল তার কামরায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল। তার সহযোগী এক বোম্বেটের হাতে একটি পিতলের বিশাল থালা। ক্রুদ্ধ গলায় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ভাস্কো —ওর হাত দুটো কাটো এই মুহূর্তে।

আমাকে মেরো না—তোমার পায়ে পড়ি—তোমার পায়ে—আর কথা শেষ হলো না। মুহূর্তে হাত দুটো ছিটকে এসে পড়ল মাটিতে। তাজা রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগল জাহাজের পাটাতনের ওপরে।

এইখানেই শেষ নয়। থালার ওপর কাটা হাত দুটো যত্ন করে রাখা হলো! তারপর ভাস্কো ডাকল এক দেশীয় পণ্ডিতকে।

হুজুর—বলুন কি করতে হবে?

তোমার কাছে শুকনো তালপাতা আছে? আরে যার ওপর তোমরা পুঁথি লেখ।

কেন হুজুর?

আরে উল্লুক—আছে কি না বলো না? লোহার নালনাগানো জুতো পরা পাদুটো আছড়ে চিৎকার করে উঠল ভাস্কো। দুচোখে আগুন ঝরতে লাগল।

আছে হুজুর—আছে—সঙ্গে তো আনিনি। আমি দৌড়ে এখুনি নিয়ে আসছি—পণ্ডিত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

একটু পরেই এক গোছা তালপাতা নিয়ে পণ্ডিত এল।

ভাস্কো বলল—এইবার তোমাদের দেশী ভাষায় লেখ—মহামান্য রাজা জেমোরিন তোমার প্রেরিত দূতের এই কাটা হাত দুটো দিয়ে তুমি কারি (ঝোল) রান্না করে খেও—তারপর তালপাতায় লেখা এই ভয়ঙ্কর বাণী আর সেই ভয়াবহ ভেট নিয়ে কালিকটের রাজার কাছে চলে গেল ভাস্কোর দূত।

আর সেই বোম্বেটেদের জাহাজ থেকে হতভাগ্য ব্রাহ্মণের একটানা আর্তচিৎকার শোনা যেতে লাগল হা ভগবান—আমাকে এরা মেরে ফেলল না কেন একেবারে মেরে ফেলল না কেন সেই আর্তচিৎকার সমুদ্রের সাঁ সাঁ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল।

আর ওদিকে জেমোরিন এই অদ্ভুত ভেট পেয়ে একেবারে শিউরে উঠল।

তারপর?

বোম্বেটেদের সেই নৃশংস ডাকাতির কথা ভাবতে ভাবতে মন ভারী হয়ে উঠল জাভার বেগের। আল্লার কাছে প্রার্থনা করল ভালোয় ভালোয় এ যাত্রা যেন এই পথটুকু পাড়ি দিতে পারে।

রাত্রি আরও গভীর হল। মাঝ আকাশে সপ্তর্ষি জ্বলছে, জ্বলছে ক্যাসিওপিয়া আর রাশি রাশি তারা। নীচে উত্তাল সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ফুলে ফুলে উঠছে।

জাহাজ চলছে।

জাহাজের নাম 'লিয়েটো'।

পর্তুগীজরা জাভার বেগের এই জাহাজের খবর পেয়েছিল। খবর পেয়েছিল ঠিকই, যে জাহাজটিতে প্রায় চারশো আরোহীর ভেতরে সুন্দরী যুবতী ছিল প্রায় দেড়শো। আর তারা শুধু যে সুন্দরী তা নয় বিত্তশালী এবং সম্ভ্রান্তও বটে। জল-ডাকাতরা গোপন সূত্রে অনেক আগেই সংবাদ পেয়েছিল. তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকদের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার আছে।

এই জাহাজ থামাও—দূর অন্ধকার সমুদ্র থেকে একটা গর্জন ভেসে এল। জাভার বেগ তার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল। কৈ, কোথাও কিছুতো দেখা যাচ্ছে না। শুধু নিঃসীম অন্ধকারে পাগলা হাতীর মত বড় বড় ঢেউ আকাশের দিকে পাঞ্জা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তার ঢেউয়ের মাথায় মাথায় জ্বলছে ফসফরাসের দীপ্তি!

এই জাহাজ—এই লিয়েটো—থামাও, ভাল হবে না বলছি—আবার দূরের অন্ধকারটাই যেন গর্জে উঠল।

এইবার দেখতে দেখতে এক এক টুকরো অন্ধকারের মত এক একটা ছিপ নৌকো চারিদিক থেকে এসে সেই তীর্থযাত্রীবাহী জাহাজটাকে একেবারে চক্রাকারে ঘিরে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে নরখাদক ভাস্কো স্বয়ং তার জাহাজ থেকে গোলা ছুঁড়তে লাগল।

মুহূর্তে সেই সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গর্জনকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ে একটা মহাপ্রলয় নেমে এল যেন। মেয়েপুরুষ. শিশু বৃদ্ধের সমবেত আর্তকলরবে রাত্রির আকাশটা যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

ভাস্কোর প্রধান সেনাপতি ভিনিসেণ্ট সোড্রে চিৎকার করে পানসীর মাল্লা অর্থাৎ সৈন্যদের বলল—তোমরা একে একে পানসী সরিয়ে নিয়ে এস—ওঃ ও গোলা ছুঁড়বে—

দুম্—দুম্—দুপ্—বিদ্যুতের মত উগ্র আলোর ঝলকানিতে মুহূর্তের জন্য চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল।

মক্কার জাহাজ থেকে শুধু কামান নয়, বৃষ্টির মত বন্দুকের গুলিও আসতে লাগল মুহুর্মুহু।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ভাস্কোর মত দুর্দ্ধর্ষ এবং নৃশংস যোদ্ধাও। আর ভিনিসেণ্ট সোড্রের মনেও বিপদের আশঙ্কা বাসা বাঁধল। একটা দেশীয় জাহাজে এত গোলন্দাজ সৈন্য আর এত গোলাগুলি! পুণ্যলোভী নিরীহ তীর্থ যাত্রীদের জাহাজ নয়—রীতিমত সুসজ্জিত রণতরী!

দ্রুত—খুব দ্রুত পর্তুগীজ পানসীরা উপকূলের দিকে সরে যেতে লাগল।

তারপর—তারপর সব চুপ। শ্মশানের মত শান্তি নেমে এল সমুদ্রে। শুধু উত্তাল ঢেউয়ের গর্জন আর শোঁ শোঁ বাতাসের একটানা শব্দ শোনা যেতে লাগল।

দুই মাথা এক হয়ে পরামর্শ করে।

ভাস্কো আর ভিনিসেণ্ট সোড্রে ভাবে, কেমন করে—কেমন করে 'লিয়েটো'কে বশে আনা যায়। তারা কথা বলে আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, লিয়েটো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে কি না।

না। চারিদিকের তরল অন্ধকারের ভেতরে আরও একটা নিকষকালো বিশাল সৌধের ইঙ্গিত দিয়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, 'লিয়েটো'। মনে হয়, ওর ভেতরের আরোহীরা যেন মরে গেছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, মাঝি মাল্লাদের অস্ফুট কথাবার্ত্তার আওয়াজ নেই, নেই কোন জীবনের চিহ্ন!

শুধু অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, কামানের নলগুলো শত্রুর জাহাজের দিকে তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটু কোন আক্রমণের সূচনা দেখলেই ছুটে আসবে কামানের গোলা।

কিন্তু লিয়েটোর ভেতরের দৃশ্যটা একবার দেখা যাক। সেখানেও একটা গোল টেবিলে বসে রয়েছে জাভার বেগ। চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। টেবিলের আর এক দিকে চুপ করে বসে আছে আরও দুইজন।

নাম্পুটিরি ও কয়াপাকি।

জাভার বেগের বন্ধু নাম্পুটিরি এক ধর্মপ্রাণ এবং বিত্তশালী ভদ্রলোক।

কয়াপাক্কি কালিকটের রাজা জেমোরিনের সেনাপতি। রাজার নির্দেশে তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে তাকে পাঠান হয়েছে।

শোন এক কাজ করা যাক তোমার নিজস্ব দাস লুডোভিকোকে পাঠাও।

সে কী—কি বলছো জাভার—লুডোভিকো একলা যেয়ে কি করবে, নাম্পুটিরির চোখে বিস্ময় ছটফট করে।

তাই তো কি বলছেন যে জেভার সাহেব, আমরা এত গোলাগুলি ছুঁড়ে কিছু করতে পারলাম না—সেখানে একটা স্লেভ!

জাভার বেগের চোখে হাসি ঝিকমিক করে। নাম্পুটিরির কানে কানে কি যেন বলে। তীক্ষ্ণ তীব্র আনন্দের বিদ্যুত ঝিকমিক করে ওঠে নাম্পুটিরির মুখে। কয়াপাক্কি বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না—কি এমন পরামর্শ দিতে পারে জেভারবেগ!

পরদিন সকালে সোনার রোদে ঝিলমিল করছে সমুদ্র।

যতদূর তাকানো যায় শান্ত নিস্পন্দ সমুদ্র। অথচ মাত্র ছয় সাত ঘণ্টা আগে নিশি রাতের অন্ধকারের আড়ালে হিংস্র জলদস্যুদের জাহাজ যে এত দৌরাত্ম্য করেছিল তার চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। দিনের আলোয় তাদের জাহাজ আর পানসী কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে সেই ধু ধু সমুদ্রের কোন দিগন্তে। কিন্তু—

কিন্তু যেই রাত্রির অন্ধকার নেমে এল ডানা মেলে, যেই ঘন কালো অন্ধকারে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল চারিদিক, অমনি দুরভিসন্ধির মূর্তির মত এসে আবার হাজির হলো সেই পর্তুগীজ দস্যুদের জাহাজ। এল গুটি গুটি পানসীগুলো। আবার আরম্ভ হলো গুলি বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে জাভার বেগের জাহাজ থেকেও পাল্টা গেল।

কিন্তু শেষ রাত্রে একটা অঘটন ঘটে গেল।

এই স্টপ—স্টপ ইট—হঠাৎ স্টপ ফায়ারিং-এর নির্দেশ দিল ভাস্কো। সেনাপতি ভিনিসেণ্ট সোড্রেকে বলল—দেখতো ওদের জাহাজ থেকে কে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

দূরে সমুদ্রের বুকে একটা সঞ্চারমান বিন্দুর মত একটি কালিকট পানসী আসছে। আসছে তীরবেগে। ক্রমশ কাছে এল সেই ছিপ নৌকো। নৌকোর গায়ে উড়ছে শ্বেত পতাকা—শান্তির আর সন্ধির প্রতীক।

হু কাম্‌স দেয়ার—গর্জে উঠল সোড্রে।

সাদা পতাকাটা উঁচিয়ে ধরে নাড়তে লাগল এক মাল্লা। আর—আর একটা দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল ভাস্কো। নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়কে তুচ্ছ করে পানসীতে করে এগিয়ে আসছে এক অসম সাহসী নারী।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই রমণী মূর্তি। অপরূপ সুন্দরী। দীর্ঘ সুঠাম তনুতে তনুতে জেগে আছে স্বাস্থ্য আর যৌবন। সুপুষ্ট পিঠের ওপর দুলছে একটি দীর্ঘ কালো বেণী। পরণে গাঢ় লাল রঙের ঘাঘরা। বুকে সবুজ কাঁচুলীর আড়ালে দুটো দূর গ্রহ চিরকালের মত গতিহারা।

ভাস্কোর চোখে অপলক দৃষ্টি।

সোড্রের বন্দুকধরা হাত কেমন অবশ মনে হয়। আর শত শত মাল্লা যেন ক্যানভাসের গায়ে আঁকা সারিবদ্ধ মানুষের ছবি।

মেয়েটিও পানসীর মাল্লাদের সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে বন্দুক ছুঁড়তে নিষেধ করছে। আর চিৎকার করে বলছে--গুলি ছুঁড়োনা সাহেব আমি একটা—বাদবাকী কথাগুলো উদ্দাম হাওয়ায় ভেসে গেল অনেক—অনেক দূরে।

ভাস্কো এবং তার লোকজন শুনল তার কথা। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না মনে হল কি একটা দুর্বোধ্য ভাষায় কিচির মিচির করছে মেয়েটা।

কিন্তু সে যাই হোক। পর্তুগীজরা কেউ একটা গুলী ছুঁড়ল না। ভাস্কো জাহাজের ডেকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল দুচোখ ভরে—সকালের সোনার রোদে উজ্জল দিগন্তবিসারী সমুদ্রের পটভূমিতে আঁকা সেই অনিন্দ্য-সুন্দর দেবীমূর্তি। সূর্যের লাল আলোর গোলকটা দিব্যজ্যোতির মত জ্বলছে তার মাথার পেছনে।

কি চাও তুমি এখানে? সোড্রে বন্দুকের ট্রিগারে হাত দিয়ে চিৎকার করে ওঠে।

স্টপ—ওকে আসতে দাও আমাদের জাহাজে, এখন কিছু বলো না।

পানসী এসে জাহাজের কাছে ভিড়ল। জাভার বেগের প্রতিনিধি সেই সুন্দরী মহিলা হাতজোড় করে বলল ভাস্কোকে—সাহেব তুমি কি চাও? তুমি দুইদিন চেষ্টা করেও আমাদের জাহাজ দখল করতে পারোনি—

পারি নি বলেই যে পারবো না, এমন তো নয়—বাজে কথা না বলে তুমি কেন এসেছ বলো—ভাস্কো ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

আমরা যুদ্ধ চাই না—সন্ধি চাই!

সর্ত কি?

সর্ত হলো—তোমার জাহাজের খোলে যত জায়গা আছে, ঠিক ততখানি চাল, ডাল, আদা, মশলা দিয়ে একেবারে ভরে দেব সাহেব। তুমি আমাদের নির্বিঘ্নে যেতে দাও—

আমি চাল ডাল আদা মশলার জন্য এত গোলাগুলি খরচ করিনি—

বলো ত তাহলে তুমি কি চাও—কি পেলে তুমি খুশী হবে—

ভাস্কো কথা বলে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে সেই মহিলার আপাদমস্তক।

সোড্রে সেই থেকে তার পিঠের দিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু সন্দেহজনক—একটু আপত্তিকর কিছু বুঝলেই গর্জে উঠবে বন্দুক।

ভাস্কো তার রক্তচক্ষু দূতীর দিকে স্থির রেখে চিবিয়ে বিবিয়ে বললে—তোমাদের জাহাজে মোট কতজন আরোহী আছে?

তা প্রায় চারশো হবে—

চা—র—শো—কেটে কেটে থেমে থেমে বলে ভাস্কো। তার ধূর্ত চোখে হাসি ঝিকমিক করে।

তার ভেতরে পুরুষ কয়জন আর স্ত্রীলোক কয়জন?

এইবার মুহূর্তের জন্য দূতীর মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে। মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বলে—তা প্রায় সাড়ে তিনশো পুরুষমানুষ আর মেয়েছেলে পঞ্চাশ—

তার ভেতরে যুবতী কয়জন?

যুবতী—মাথা নীচু করে দূতী। সলজ্জ হেসে বলে—ঠিক বলা মুস্কিল না গুণে তবে—বিড় বিড় করে বলে নিজের মনে মনে শ্রীলতা, শম্পা, চিত্রমতিকা রাবেয়া, ডলি, হেনা, রোজী, নর্গিস, আর—

আর তুমি—বলেই খপ করে তার হাত ধরে ফেলল ভাস্কো। ধরল বজ্র-মুষ্টিতে। এক টানে খুলে ফেলল তার সেই দীর্ঘ নিবিড় বেনীর পরচুলা। খুলে ফেলল কাঁচুলী। বেরিয়ে পড়ল রমণীর সেই যুগল অমৃত কুম্ভের কৃত্রিম উপকরণ নারকেলের মালা আর কিছু তুলো এবং কিছু পুরানো কাপড়।

সোড্রে এবং আর অন্যান্য পর্তুগীজ দস্যুদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়েছে। কারো মুখে একটা কথা নেই।

সেই মনলোভা সুন্দরী রমণী মূর্তির আড়ালে বেরিয়ে পড়ল সুন্দর গঠনের এক সুপুরুষ। কিন্তু পরনে লাল ঘাগরার নীচে দাসদের সেই কালিঝুলি মাখা ডোরাকাটা ইজের! শক্ত সমর্থ পুরুষ।

তুই কে? কেমন করে তোর এত সাহস হলো?

ধরা পড়া গুপ্তচর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। বলল—আমি দাস—আমি স্লেভ সাহেব—আমার নাম—লুডোভিকো।

লুডোভিকো—হা—হা—হা! অট্টহাসি হেসে উঠল ভাস্কো। হাসি থামতেই তার চোখে ফুটে উঠল জিঘাংসা।

লুডোভিকো ভয়ে শিউরে উঠল। বলল—আমাকে শুধু বন্দী করে রাখো সাহেব—আমাকে—তার কথা তার শেষ হলো না।

শয়তান তোকে কে পাঠিয়েছে বল শিগগীর—

আমাকে পাঠিয়েছে জাভার বেগ, নাম্পুটিরি আর যারা ওই জাহাজে আছে তারা আমাকে জোর করে মেয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছে—

মেয়ে সাজাতে গেল কেন?

স্যার ওরা বোধহয় ভেবেছে এদেশী মেয়েদের ওপরে তোমাদের খুব লোভ—মেয়ে হয়ে এলে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে বেশী আর আমাদের খুব সহজে বশে আনতে পারবে—

থামো সোড্রে—খুব কঠোর গলায় বলল ভাস্কো—বেশী বুঝতে চেষ্টা করো না, এই শয়তানটাই যে সব সত্যি কথা বলছে তার কি মানে আছে? এইবার ভাস্কো লুডোভিকোর সামনে এল। তার চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, ঠিক করে বল এইবার, তোকে কেন পাঠিয়েছে ওই কুকুরেরা?

আমি দাস সাহেব—একেবারে কেনা গোলাম। আমাকে যা বলবে তাই করতে হবে, কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল হতভাগা দাস লুডোভিকো—আমাকে যখন যা করতে বলবে তাই করতে হবে—

কি কি বলেছিল—খুলে বলো, যদি বাঁচতে চাও—

আমাকে—আমাকে গুপ্তচরের কাজ করতেই পাঠিয়েছিল। বলেছিল, মোট কতজন গোলন্দাজ সৈন্য আছে, কয়টা কামান আছে, কয়টা বন্দুক আছে এ সব খবর আনতে বলেছিল আমাকে। আর—

আর কি? বলেই ভাস্কো সপাং করে একটা চাবুকের ঘা মারল তার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল লুডোভিকো।

শোন, এইবার তুই বল তোদের কয়টা বন্দুক, কয়টা কামান?

আমি আপনাকে সব বলবো সাহেব, বলুন আমাকে প্রাণে মারবেন না—বলুন—

সে সব পরের কথা আগে তুই বল—

মাত্র ছয়টা—ছয়টা বন্দুক আছে নীচের ডেকে, আর ওপরে আছে দুটো বড় কামান আর বারোটা—চুপ করে গেল লুডোভিকা। ভয়ে ভয়ে তাকালো ভাস্কোর হাতে শঙ্কর মাছের চাবুকের দিকে।

হাসল ভাস্কো। দেবদূতের মত অভয় দিয়ে বলল—ভয় নেই—তোর কিছু ভয় নেই রে—যখন আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছিস—

লুডোভিকোর ঘামে ভেজা আর ভয় পাওয়া মুখে হাসি ফুটে উঠল তাহলে সে বেঁচে থাকবে! মরবে না! না হয় সাহেবদের গোলামীই করবে আজীবন। জন্ম থেকে যখন দাসত্ব করছে তখন তার কাছে প্রভু হিসেবে নাম্পুটিরি এবং জাভার বেগও যা, ভাস্কো ভিনিসেণ্ট সোড্রেও তাই!

নিয়ে এসেছো?

ভাস্কোর এই কথায় এবং তার এক ভৃত্যের হাতে লাল গনগনে তপ্ত লৌহশলাকা দেখেই তার সুখস্বপ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দুই হাত পাতো—

সাহেব আমাকে প্রাণে মেরো না—মেরো না—দু হাতে বুক চেপে ধরে হাউ 'হাউ করে একেবারে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলল লুডোভিকো।

কিন্তু ততক্ষণে জল্লাদের মত এক দস্যু সেই গরম লোহার শিক দিয়ে হাতের তালু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। প্রহৃত জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল লুডোভিকো!

এখানেই শেষ নয়।

দুটো হাতের তালুতেই লোহার শিক দিয়ে ছিদ্র করে দেওয়া হলো, সেই ছিদ্রের চারিদিকে আশেপাশেও খানিকটা পুড়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সেই হতভাগ্য দাস।

সে যত বেশী কাতর গলায় চিৎকার করে ততই নিষ্ঠুর হাসি হাসে দস্যু ভাস্কো, বলে—আভি—কুত্তাকা কান লে—আও—

একটা মগে করে কুকুরের দুটো কাটা লম্বা কান নিয়ে এল একজন।

আভি বৈঠো ভুঁই পর—চিৎকার করে বলল ভাস্কো-ডি-গামা। তার চোখে নিষ্ঠুর কৌতুক জল জল করছে।

মৃতপ্রায় সংজ্ঞাহীন মানুষটাকে ডেকের ওপরে শুইয়ে রাখা হলো।

ভাস্কোর নির্দেশে এল মুচি। কুকুরের দুটো কান বেশ সুন্দর করে লুডোভিকোর কানের সঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হলো।

কুকুরের দীর্ঘ কান জুড়ে দেওয়া এবং বেতের ঘায়ে জর্জরিত লুডোভিকোর সেই বিচিত্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল পর্তুগীজ দস্যুরা। কিন্তু গম্ভীর—ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল ভাস্কো। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে আচ্ছন্ন তার মস্তবড় মুখখানা কেমন থমথম করতে লাগল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—শুধু ভারতে আমার পথের প্রথম আবিষ্কর্তা বলে নয়—সবাই জানুক নিষ্ঠুরতার আর নৃশংস অত্যাচারে আমার জুড়ি নেই। একটু থামল সেই দুঃসাহসী নাবিক—সেই রক্ত পিপাসু হিংস্র জলদস্যু ভাস্কো। বহু—বহু দূরে ভারতের উপকূলের ঘন কালো দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলল—যেমন করেই হোক, এই সোনার দেশে আমাকে উপনিবেশ স্থাপন করতেই হবে—

হো হো—দেখ—দেখ কুকুরের কান লাগিয়ে কেমন বেড়ে লাগছে দেখ—

ভাস্কোকে গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখে পর্তুগীজ দস্যুরা দূর থেকে অস্ফুটস্বরে বলছে আর হাসাহাসি করছে।

একটু চুপ কর! শয়তানেরা—বলেই পা দিয়ে ডেকে একটি লাথি মারল ভাস্কো। কেঁপে উঠল সারা ডেক। লুডোভিকোর দিকে তাকাল। হঠাৎ যেন সহানুভূতির আবেগ টলমল করে উঠল তার চোখে। বলল—এই কে আছিস—ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দে—

দস্যুরা বোকার মত বড বড় চোখে তাকাল ভাস্কোর দিকে। স্বপ্ন দেখছে না তো!

হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কি। এখুনি ওর বাঁধন খুলে দাও—ওর সেবা-শুশ্রূষা করে ওকে সুস্থ করে তোল।

ভাস্কোর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হল। হতভাগ্য এই দাস লুডোভিকো পরে ভাস্কোর একান্ত ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর হয়েছিল। সে সারাজীবন পর্তুগীজদের সঙ্গেই ছিল। থাক তার কথা এখন—

লুডোভিকো আর ফিরে এল না। এল না তারপরের দিনও।

জাভার বেগ চিন্তিত হয়ে উঠল।

নাম্পুটিরি বলল—চলো—আর একবার জাহাজ চালানোর চেষ্টা করে দেখা যাক।

কয়াপাক্কি কোন কথা বলল না। কার ওপরে যেন তীব্র ক্রোধে জ্বলে যেতে লাগল। বিড বিড় করে বলল—হুকুম পেলেই ত হয়—আর একবার কামান ছুঁড়ে বিপর্যস্ত করে দেই সাদা কুত্তাদের—

কিন্তু লুডোভিকোর কি হলো?

কি আর হবে—ও যে পুরুষ তা ধরে ফেলেছে। এতক্ষণে হয়ত ডালকুত্তা দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে—

আবার তিন মাথা এক হয়ে পরামর্শ করে। কি করা যায়—কেমন করে এই পর্তুগীজ জলডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কতদিন—আর কতদিনই বা এই ধু—ধু সমুদ্রে ওদের নজরবন্দী হয়ে থাকা যাবে মাঝিমাল্লা এবং সৈন্যদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছে দিনের পর দিন। ভেতরে মেয়েদের কান্নাকাটির রোল পড়ে গিয়েছে। তারা কেউ আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকছে—কেউ নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে! সমস্ত জাহাজে যেন নিদারুণ একটা শোকের ছায়া নেমেছে!

আমার মনে হয়, আর একবার আমাদের যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত কয়াপাক্কি বলল—ওরা আক্রমণ করলে—করবে—

যুদ্ধ হয় হোক—হয় এস্পার—না হয় ওস্পার—কয়াপাক্কির এক অদ্ভুত দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল।

দুই জাহাজেরই যোদ্ধাদের হাত নিসপিস করে। কিন্তু জাভার বেগও যুদ্ধ করে না—করে না ভাস্কোও। সমুদ্রের বুকে কিছু দূরে দূরে দুটো অর্ণবযান দুই হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়।

এক একটা উত্তাল ঢেউ বালুচরের বুকে আছড়ে পড়ে। ধু—ধু বালুচরে ধুলোর ঘূর্ণি পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে আকাশের দিকে। দূর আকাশে বাতাসে সমুদ্রে ডানা মেলে ভাসতে থাকে কয়েকটি সমুদ্র পাখি। বেশ বুঝতে পারা যায়, উপকূল খুব দূরে নয়!

কতদিন—আর কতদিন যে এভাবে থাকতে হবে—জাহাজের জানালায় দাঁড়িয়ে এক অষ্টাদশী তরুণী দূরে দুপুরের রোদে ঝিকিমিকি সমুদ্রের জলের দিকে. তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল। তার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছে

চারিদিকে দুস্তর জল রাশি দিয়ে ঘেরা এই বিশাল কারাগার থেকে আর কখনো কোনদিনও মুক্তি পাবে না তারা—

পুষ্পবেণী কি ভাবছো, সস্নেহে একটি হাত রাখল নাক্কিকার তার পিঠে।

পুষ্পবেণী কোন কথা বলল না। শুধু নাক্কিকারের হাত দুটো পরম আদরে জড়িয়ে ধরল। আস্তে আস্তে যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল—আপনি আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না—

কেন একথা বলছো পুষ্পবেণী?

আমার মালিকের মেয়ে আমাকে খুব চোখে চোখে রাখছে—

কিন্তু কুললক্ষ্মীকে যে আমার একটুও ভাল লাগে না পুষ্পবেণী, ভেতরে ভেতরে অসহ্য একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে বলল নাক্কিকার—যেহেতু বাবার বন্ধু নাম্পুটিরির মেয়ে তাই তাকে ভালবাসতে হবে—

পুষ্পবেণী কোন কথা বলল না। গভীর আবেশে নাক্কিকারের চওড়া বুকে মাথা রাখল। অস্ফুটস্বরে বলল—আমি নাম্পুটিরির দাসী নাক্কিকার—টাকা দিয়ে কেনা দাসী, আমাকে ভালবাসতে নেই। তুমি আমাকে—আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো, বলেই তীব্র আবেগে অস্থির হয়ে তার ঘন চুলে ভরা মাথাটা তার বুকে ঘসতে লাগল। তাকে নিবিড় ভাবে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে ডালিমের দানার মত রাঙ্গা হাল্কা দুটো ঠোঁটে চুমু এঁকে দিল নাক্কিকার।

বর্ষার কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল পুষ্পবেণীর তনু। তীব্র—তীব্র একটা আবেগ গলার কাছে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট গলায় বলল, তুমি—তুমি এ কী করলে! বলতে বলতে বাইরের অন্তহীন সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউয়ের মত আবার আছড়ে পড়ল নাক্কিকারের বুকে। দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিল নাক্কিকারের মুখ।

খস—কার একটা পায়ের শব্দ হলো।

ছিটকে সরে দাঁড়ালো দুইজন। যেন কেউ কাউকে চেনে না।

কি রে পুষ্পবেণী, তুই এখানে কি করছিস? একটা বিষাক্ত সাপিনীর মত তীব্র আক্রোশ ভরা চোখে কুললক্ষ্মী তাকিয়ে রইল তার দিকে।

এই বাবুর জন্য একটু সুগন্ধী তামাক চাইতে এসেছিলাম ওনার কাছে—

নাক্কিকার তো তুলোর কারবার করতো জানতাম। আজকাল তামাকের কারবার করছে নাকি?

পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যই নাক্কিকার বলল—তোমার বাবা অম্বুরী তামাক খুব ভালবাসেন তো—সেটা ফুরিয়ে গিয়েছে বলেই ও এসেছে—

চুপ কর শয়তান—গর্জে উঠল কুললক্ষ্মী। আহত একটা বাঘিনীর মত গজরাতে গজরাতে ঝড়ের বেগে চলে গেল—গেল নাম্পুটিরির কাছে।

ঝপ—ঝপ—ঝপ, সমুদ্রের জলে দাঁড় পড়ল। পাল খাটানো হলো।

স্বাভাব বেগের জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। যত দূর চোখ যায় ধু—ধু করছে সমুদ্র। কোথাও কিছু নেই। শুধু মাস্তলের আশেপাশে চক্রাকারে ঘুরছে দু'তিনটা এ্যালবেট্রাস! ওরা বোধ হয় আমাদের শক্তি বুঝতে পেরে সরে পড়েছে, কয়াপাক্কির চোখ দুটো খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বেশী দিন তো নয়—মেরে কেটে আর দুটো দিন চলতে পারলেই আমরা কালিকট পৌঁছে যাবো।

কালিকটের যত কাছাকাছি যাবো ততই আক্রমণের ভয় কমে যাবে—

জাভার বেগ আর নাম্পুটিরি ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলে। আর তীক্ষ্ণ চোখে সমুদ্রের জলরাশি ছাড়িয়ে দূরদিগন্তের দিকে তাকায়।

না—কোথাও একটা বিন্দুর মতও দেখা যাচ্ছে না কিছু।

তবুও বিশ্বাস নেই। ভরসা নেই। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ কোথায় থেকে হয়ত দুর্দ্ধর্ষ জলডাকাতদের ছিপ নৌকো এসে হাজির হবে। এমন ছিপ নৌকো যার প্রতিটি মাল্লা, প্রতিটি দাঁড়ীই সুনিপুণ যোদ্ধা।

তাই সেনাপতি কয়াপাক্কি প্রস্তুত হতে লাগল—প্রস্তুত হতে লাগল জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য।

নির্বিঘ্নে দুপুর কেটে গেল। কেটে গেল বিকেল। রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে সূর্যও অস্ত গেল। মনে হল, সমুদ্রের নীল জলে কে যেন আবীর গুলে দিয়েছে। দেখতে দেখতে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে এল চারিদিকের দিগন্ত।

রাত্রি নামল। আকাশ আর সমুদ্র নিবিড় অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে গেল। বিশ্বচরাচরের যেদিকে তাকাও অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর লিয়েটোর আরোহীদের মনে হল—মনে হল তারা যেন তীব্র বেগে কোন অতল অন্ধকার শূন্যে চলেছে। যাচ্ছে ঠিক! কিন্তু বুকে ভয়ের ধুকুপুকু কখন কি হয় বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না। হা ভগবান! আর দেড়দিন—আর দেড়দিন কোন রকমে যেতে পারলেই হয়—

দুম্—দুম্—দুম্ সমুদ্রের তীব্র একটানা গর্জনকে বিদীর্ণ করে বন্দুকের শব্দ হলো। ভানুমতীর খেলার মত হঠাৎ কোথায় থেকে এক এক টুকরো ছায়ার মত রাশি রাশি পানসী এসে ঘিরে ফেলল মক্কা ফেরত লিয়েটোকে।

কয়াপাকি চিৎকার করে আরোহীদের সতর্ক করল, এই তোমরা যে যেখানে আছো—খুব—খুব সাবধানে থাক—জলডাকাতরা আবার আমাদের আক্রমণ করেছে—

দুম্—দুম্—দুম্ লিয়েটো থেকে পাল্টা উত্তর গেল। গোলন্দাজ সৈন্যরা তাড়াতাড়ি করে নিচের ডেকের ছয়টি কামানে গোলা ভরতে লাগল। মাল্লারা দাঁড় ফেলে রেখে বন্দুক হাতে নিল। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

দুই পক্ষের গোলাগুলির তীব্র শব্দে সমুদ্রের গর্জনও চাপা পড়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারে শুধু থেকে থেকে এক একটা হলদে আলোর ঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কালিকটের বন্দুকের পাল্লা অত্যন্ত কম। বারুদও তেমন জোরালো নয়। কেমন ভেজা ভেজা। পর্তুগীজদের বন্দুকের মত তীব্র আওয়াজ হচ্ছে না। কেমন ভ্যাস ভ্যাস শব্দ হচ্ছে।

ভাস্কোর নৌবহর ঠিক একটি সাঁড়াশীর মত আকার নিয়ে ধীরে ধীরে লিয়েটোর দিকে এগিয়ে আসছে।

হা ভগবান।

জয় বাবা শঙ্কর!

আমাদের কি হবে—কি হবে—ওরা যে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে, মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বর্ষীয়সী মহিলা সুন্দরী তরুণী মেয়েদের কাউকে বজরার খোলের ভেতরে, কাউকে কাপড়ের গাঁটের ভেতরে—যাকে যেখানে পারল লুকিয়ে রাখতে লাগল। তারপর—

তারপর—তারপর মহিলারা সব একজোট হয়ে যার যত গয়নাগাঁটি আছে সমস্ত জড়ো করে জাভার বেগকে ডেকে নিয়ে এল।

হুজুর, আমাদের একটা আর্জি আছে, বোম্বেটেরা তো টাকা চায়, গয়না চায়। আমাদের প্রত্যেকের গয়না এখানে আছে—

সে কী—কি বলছো তোমরা!

কেন, আমরা আর কতদিন এই সমুদ্রে অন্তরীণ হয়ে থাকবো?

আর আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের বিপদ তো আরও বেশী!

মেয়েরা আরও অনেক কথা বলে। কেউ কেউ ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়ে জাভার বেগের পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলে—আপনি সন্ধির ব্যবস্থা করুন—

না। আপনারা যতই বলুন, আমরা আপোষ করবো না—যুদ্ধ করবো—

ওদের বন্দুক কামানের সামনে তোমরা দাঁড়াতে পারবে না কয়াপাক্কি—জাভার বেগের স্ত্রী আমিনা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

ওদিকে যুদ্ধ চলছে। একটু একটু করে সাঁড়াশী আক্রমণের আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। মেয়েদের ভেতরে কান্নার আর্তস্বর আরও তীব্র হয়ে উঠছে। কোন কোন গোলন্দাজ সৈন্যের গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

ঝপ্—ঝপ্—ঝপ্—দু'তিনজন লাফিয়ে পড়ল জলে। বোম্বেটেদের হাতে বন্দী হয়ে অশেষ নিগ্রহ সহ্য করার চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল।

কিন্তু বোম্বেটেদের হাত থেকে নিস্তার নেই। তারা জলে ভাসমান মানুষগুলোর দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ মুহূর্তের জন্ত শোনা গিয়েই সমুদ্রের গর্জনের শব্দের ভেতরে তলিয়ে গেল।

না কয়াপাক্কি—আর দেরী করে চলে না—জাভার বেগ বোঝানোর চেষ্টা করে—আমাদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে—

কিন্তু কাকে—কাকে আপোষের প্রস্তাব নিয়ে পাঠানো হবে, নাম্পুটিরি বলল—ওই তো লুডোভিকোকে পাঠালাম। সে আর ফিরে এল না—

না, দূত পাঠাবেনই যদি—দাসদাসী পাঠালে চলবে না, কয়াপাক্কি বিরক্ত হয়ে বলল, ভাস্কোর কাছে কেউ গেলে আমাদেরই কাউকে যেতে হবে—

দুম্—দুম্—দুম্—অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি চলেছে ভাস্কোর জাহাজ থেকে।

লিয়েটোর মাল্লারা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ গুলির ঘায়ে টলে পড়ছে সমুদ্রের জলে। মেয়েদের আর্তনাদে, জখমী মাল্লাদের চিৎকারে, শিশুদের কান্নায় যেন সেই সমুদ্রে মহাপ্রলয় নেমে এল।

দ্রুত পায়ে কুললক্ষ্মী এল পুষ্পবেণীর কাছে। তার সঙ্গে এল জাভার বেগের স্ত্রী, এল আরও অন্যান্য বর্ষীয়সী মহিলারা। পুষ্পবেণীকে ঘিরে ধরে দাঁড়ালো। কুললক্ষ্মীর প্রস্তাবে সায় দিয়ে তারা প্রত্যেকে বলল, পুষ্পবেণী, আমাদের গয়নাগাঁটি সঙ্গে করে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তোমাকে যেতে হবে—

আমি—আমি কেন—তার বুকের ভেতরে যেন একটা তীর বিঁধে গেল। চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল চলে এল।

হ্যাঁ, তোমাকে—তোমাকেই বোম্বেটেদের জাহাজে যেতে হবে শয়তানী,

কুললক্ষ্মী চিবিয়ে চিবিয়ে বলে। তার ঠোঁটের কোনায় কোনায় নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার ধারালো হাসি ছুরির ফলার মত ঝিকমিক করতে লাগল।

আপনারা আমাকে যে শাস্তি দিন না আমি মাথা পেতে নেব—কিন্তু দয়া করে বোম্বেটেদের জাহাজে আমাকে পাঠাবেন না, আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল হতভাগী দাসী পুষ্পবেণী।

না, তোমার কোন কথা শুনবো না আমরা। তোমাকে যেতেই হবে এবং আজই শেষরাত্রে যেতে হবে। তুমি তৈরী হও—মেয়েরা চলে গেল। শুধু কুললক্ষ্মী একটা শয়তানীর প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। পুষ্পবেণীর চিবুকে ঠোনা মেরে বলে—যা এইবার তোর নাগরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি কর—

হা—হা—হা—পিশাচীর মত অট্টহাসির সেই ভয়ঙ্কর শব্দ বিপদের আশঙ্কায় থমথম সেই জাহাজের নিস্তব্ধতার বুক ছিঁড়ে বয়ে গেল লহরে লহরে।

রাত্রি নামল গভীর হয়ে। দূর আকাশের কোন গিন্নী শকুনের ঠোঁটের মত এক টুকরো মেঘ দেখা দিল। দেখতে দেখতে মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। প্রচণ্ড বাতাস আর সেই সঙ্গে শুরু হলো বৃষ্টি!

পুষ্পবেণীর কিন্তু এসব দিকে খেয়াল নেই। ঘুম নেই তার চোখে। আর দুই দণ্ড পরেই তাকে যেতে হবে—যেতে হবে হিংস্র পশুদের ভেতরে। তারা মহোল্লাশে তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। কি করবে সে—কি করবে—সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে! দূর নিবিড় অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উন্মত্ত দাপাদাপি দেখতে পাচ্ছে! এখুনি—সেখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে সে কুটোর মত ভেসে যাবে। কুমীর হাঙ্গরে খেয়ে নেবে। মৃত্যু! না—না—তার এই ভরা বয়স, এই রূপ এই যৌবন, —না মরতে সে পারবে না। মৃত্যু যে মনের কোথাও বাসা বাঁধেনি!

পুষ্পবেণী। অন্ধকারে ফুলের মত ফুটে উঠল খুব মৃদু একটা কণ্ঠস্বর।

নিঃশব্দ পায়ে, এসে দাঁড়ালো নাক্কিকার। ঘূর্ণিবাতাসে পাক খেতে খেতে উড়ে আসার মত তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুষ্পবেণী। বলল, তুমি তুমি আমাকে বাঁচও—আমাকে বাঁচাও।

নাক্কিকার কোন কথা বলল না। শুধু শক্ত করে—আরও শক্ত করে—তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরল!

তুমি—তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পারো না—পারো না…

চল আমরা দুজনে এক সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি—যতক্ষণ পারবো, দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ভেসে থাকবো।

পুষ্পবেণী কোন কথা বলল না। শুধু ঘন—ঘন হয়ে তার নিশ্বাসের সীমানায় হয়ে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে যেন বহু—বহুদূর থেকে বলল—তুমি—তুমি আমার জন্য মরবে—তুমি আমাকে এত ভালবাসো—বাদবাকী কথাটা আর বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না—না আমার জন্য তুমি আমার জন্য মরবে কেন—তোমার কুল—

কেন তুমি আমাকে এমনি করে আঘাত করো পুষ্পবেণী, নাক্কিকার যন্ত্রণায় জলে যেতে যেতে বলে—চলো—চলো পুষ্পবেণী, আমরা পালাই—

কোথায় যাবে। চারিদিকে জল—

আমার নিজস্ব একটি ছিপ নৌকা আছে। তার দুইদিকে আঠারো আঠারো করে ছত্রিশজন মাল্লা আছে তারা প্রত্যেকে খুব ভাল যোদ্ধা—চল—

খস—কার পায়ের শব্দ হলো।

বাইরে দুর্যোগের ঘনঘটা। বাইরে শত্রুর উদ্যত কামানে মৃত্যুর নিশানা। তারা ঝড় জল মাথায় করে এগিয়ে আসছে লিয়েটোর দিকে। ভাস্কোর বুকের ভেতরে রক্তের কলধ্বনি বাজছে। তীব্র উল্লাসে মত্ত রক্তপিপাসু বোম্বেটেরা চিৎকার করছে।

কেউ জাহাজ থেকে নামবে না—কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করো না—যে করবে সে গুলি খাবে—কে—কে—ওখানে ? কুললক্ষ্মী চীৎকার করে উঠল। ছুটে এল জাভার বেগ, এল কয়াপাক্কি এল নাম্পূটিরি। তারা সবিস্ময়ে দেখল, জাহাজের পালের একটি মোটা দড়িতে ঝুলছে দুটো ছায়াদেহ—

সে কী নাক্কিকার ! তুমি ওই শ্লেভ মেয়েটার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছো—গর্জে উঠল কয়াপাক্কি—শীগগীর উঠে এস—তা নাহলে গুলি ছুঁড়বো—

প্রেম—প্রেম—বুঝতে পারছো না বাবা, ওই শ্লেভ মাগীটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে শয়তানটা—হিংস্র বাঘিনীর মত চিৎকার করে উঠল কুললক্ষ্মী।

জাভার বেগের হুকুমে তিনচার জন খালাসী নাক্কিকারকে জোর করে ধরে নিয়ে আসতে গেল। তখন পুষ্পবেণী ডুবন্ত মানুষের মত আঁকড়ে ধরল নাক্কিকারকে। জাহাজের ওপর থেকে হুকুম এল, তোমরা দেখছো কি শ্লেভটাকে বোটে নামিয়ে দাও—

সেই দুর্যোগের রাত্রে পুষ্পবেণীকে চাবুক মেরে শত্রুর মুখে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হলো। তার অপরাধ, সে দাসী। সে একটা শ্লেভ গার্ল! নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভুদের নিরাপদে রাখাটা তাদের কর্তব্য। আর দ্বিতীয়ত সে দাসী হয়ে নাম্প্টিরির বন্ধুর ছেলে নাক্কিকারকে ভালবেসেছিল! অথচ নাম্পুটিরির মেয়ে তার বাগদত্তা।

বিশ মাল্লার একটা ছিপ নৌকাতে পুষ্পবেণীকে তোলা হলো। তার কাছে পুঁটলী করে দেওয়া হলো লিয়েটোর সমস্ত মেয়েদের বহুমূল্য অলঙ্কার।

যাও—তুমি বুঝিয়ে বলবে ভাস্কোকে—এইসব দামী অলঙ্কারের বদলে আমাদের ছেড়ে দিতে পারে কি না—ওপর থেকে চিৎকার করে বলল ছাভার বেগ।

পুষ্পবেণী—তোর ওপরেই আমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে দেখিস কিন্তু—মেয়েরা বলল।

কিন্তু তাদের সমস্ত কথা, ঝড়ের গর্জন, বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মাতামাতি সব কিছুকে ছাপিয়ে দুর্ভাগিনী পুষ্পবেণীর বুকফাটা কান্নার তীব্র শব্দ শোনা গেল। ধীরে ধীরে সেই অপস্রিয়মান নৌকো থেকে কান্নার শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল।

আলবুকেরুখি আর পারল না—আর পারল না পড়তে। কি হবে পড়ে? বইটির অক্ষরে অক্ষরে দুর্ভাগিনী পুষ্পবেণীর মত কত অসংখ্য কত অগনণ দাসীর বুকফাটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। ক্লান্ত চোখ দুটোর দৃষ্টি মেলে ধরল দূরে আরব সমুদ্রের বিশাল জলরাশির দিকে। তার মনে হল—মনে হল কত রক্তপাত, কত মৃত্যু, কত হাহাকারের ইতিবৃত্ত লেখা আছে ওই সাগরের লোনা জলের অণুতে অণুতে। বেদনাদীর্ণ দীর্ঘ সেই ইতিহাস লেখা কি তার কাজ?

॥ পাঁচ ॥

তুমি কদিন থেকে কি ভাবছো, মার্থা বলল, এবই-ওবই নেড়েচেড়ে কি দেখছ—কিন্তু—

লিখছি না, হেসে বলল আলবুকেরুথি, তাইতো দিদি!

আমার ইউনিভারসিটি খোলার সময় হয়ে এল আমি পাঞ্জীমে চলে যাবো। বইটা দেখে যেতে পারলাম না—

দেখবি—দেখবি অত ব্যস্ত কেন দিদি? একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল, জানিস মার্থা, শুধু দাসদাসীদের ওপর মর্মান্তিক অত্যাচারের ইতিহাস তো—লিখতে ইচ্ছে করছে না। বইটা মনোটোনাস হয়ে যাবে--

মার্থার মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল।

আচ্ছা একটা ঘটনা পেয়েছি—একটু অন্যরকম, আলবুকেরুথি, বলল, শোন তো দিদি একটু—শুনলে বুঝবি ভাস্কোর মত দুর্দ্ধর্ষ লোককেও—

আঃ দাদু—তুমি শুধু ঘটনাটা বলো—

ভাস্কোডিগামা।

শতাব্দীর ইতিহাসের নায়ক।

শুধু প্রথম ইউরোপীয় পথপ্রদর্শক নয়। নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতাতেও সে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এই ভাস্কোডিগামাকেও এদেশ খুব সহজে স্বীকার করেনি। পদে পদে তাকে বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। যুদ্ধ করতে হয়েছিল দুহাতে তলোয়ার নিয়ে। যুদ্ধ করতে হয়েছিল দেশী ও বিদেশী (ইংরেজ ফরাসি ডাচ) শত্রুদের সঙ্গে।

কালিকটের রাজা। স্বাধীনচেতা জামোরিন সবচেয়ে বেশী আঘাত হেনেছিল।

সেদিনও সর্বসাক্ষী আকাশে আবির ছিটিয়ে সূর্য উঠেছিল। ভারত মহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে কে যেন গাঢ় লাল রঙ গুলে দিয়েছিল; আর পর্তুগীজ নৌবহরের বড় বড় জাহাজের মাস্তুলের শীর্ষে শীর্ষে রক্তচন্দনের মত প্রথম সূর্যের আলো চিক চিক করছিল।

শান্ত সমুদ্র।

যতদূর তাকানো যায়, ঢেউগুলো দামাল ছেলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকের সেই নিবিড় স্তব্ধতা, সেই প্রগাঢ় শান্তিকে বিঘ্নিত করে হঠাৎ কালিকট শহর সংলগ্ন সমুদ্রতীর থেকে গর্জে উঠল কামান।

দুম—দুম—দুম—

ঝলসে উঠতে লাগল লাল আগুনের ঝলক। পর্তুগীজ জাহাজগুলো এই অতর্কিত আক্রমণে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। কিন্তু পর্তুগীজরা তৈরী

হতে হতেই কামানের গোলায় তাদের তিনটা জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর একটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

নিপুণ নাবিক, হিংস্র জলদস্যু ভাস্কো দা গামা বাদবাকী আর আটটা জাহাজ নিয়ে দূর সমুদ্রে কালিকটের কামানের পাল্লার বাইরে পালিয়ে গেল। কিন্তু ভাস্কো পালিয়ে যাওয়ার লোক নয়। তার নিজের জাহাজের ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে দুহাতের করতল চোখের ওপরে রেখে রোদ আড়াল করে দূরে—বহুদূরে তাকিয়ে দেখল কালিকটের বালুচরের দিকে—

বালুচরে শিল্কের ওড়নার মত সোনার রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই রৌদ্রালোকিত দীর্ঘ বালুচরের পটভূমিতে কালিকটের গোলন্দাজ সৈন্যদের কালো কালো ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে। ওরা আক্রোশে কামানের গাড়ী টেনে নিয়ে সমুদ্রের কিনারে আসছে। যদি আরও—আরও দু একটা বিদেশী শত্রুর জাহাজ ধ্বংস করা যায়। কিন্তু—

দেশী রাজা এত দূরপাল্লার এমন শক্তিশালী কামান পেল কি করে। চোখ দুটোর দৃষ্টি দূরে কালিকটের বালুচরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভাস্কো ভাবে, নিশ্চয়ই জেমোরিন বিদেশী কোন রাজার সাহায্য নিচ্ছে খুব গোপনে। তা'নাহলে কালিকট কেন, ভারতের উপকূলবর্তী প্রতিটি প্রদেশের গোলন্দাজ সৈন্যের শক্তি সে জানে। জানে ওদের আছে গাদা দেশী বন্দুক তা দিয়ে শুধু পাখী মারা যায়। ভ্যাস ভ্যাস শব্দ করে। বন্দুকের নলে আগুনের ঝিলিকও দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়া—নীল ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেরোয়।

কিন্তু এ তো সাংঘাতিক কামান।

বজ্রপাতের মত শব্দ হচ্ছে। বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠছে উগ্র শাদা আলো। আর গোলাগুলো ছুটে এসে পড়ছেও অনেক—অনেক দূরে অতএব—

—অতএব খবর নিতে হবে। নিতে হবে খুব-খুব গোপনে।

কয়েকমাস পর। আর—ভারত মহাসাগরে কি আরব সমুদ্রে পর্তুগীজ জাহাজের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। কঙ্কন আর করোমণ্ডলের উপকূলের মানুষ অধিবাসীরা বহুকাল পর পরমনিশ্চিন্ত কয়েকটা দিন ঘুমিয়ে নিল। বানিজ্যতরীগুলো—দেশীয় নৌকার বহর পণ্য বোঝাই হয়ে অবাধে সমুদ্র পাড়ি দিল।

জেমোরিনের মনও আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল। শক্তিশালী বিদেশী শত্রুদের

দেশ থেকে, ভারত মহাসাগরের এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছে। মনের খুশীতে সে কোচিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল।

জয়।

জয় সেখানেও অনিবার্য। বিদেশী কামানের গোলার কাছে দাঁড়াতে পারবে কেমন করে দেশী বন্দুকধারী কোচিনের সৈন্যরা। তিন দিনেই কোচিনের রাজা বশ্যতা স্বীকার করল।

কালিকটে বিজয় উল্লাসের স্রোত বয়ে চলল। রাজপথে সুবেশ নরনারীর ভীড়। পণ্যসম্ভারে সজ্জিত বিপণীতে বিপণীতে আলো ঝলমল করছে। আজ কোন দোকানী কোন ক্রেতার কাছে থেকে পণ্যের মূল্য বাবদ একটা পয়সাও নিতে পারবে না! জেমোরিনের আদেশে বিনামূল্যে যে কোন পণ্য পাওয়া যাবে।

তীব্র আনন্দে উদ্বেলিত শহরের উচ্ছ্বসিত জনতার ভেতরে দেখা গেল এক মুসলমান ফকিরকে। অপূর্ব সুন্দর চেহারা। দুধে আলতামেশানো গায়ের রঙ। গৌরবর্ণ দীর্ঘ চেহারা। বুক অবধি দাড়ি। দাড়িতে মেহেদী রঙ। তাকে ঘিরে জনতার ভীড়।

ভীড় যত বাড়ছে পথচারীদের কৌতূহল তত বাড়ছে। সবাই পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। যারা দেখতে পেল, তারা অবাক হয়ে গেল। ফকির পাথরের রাস্তার ওপর একটা শাজিম বিছিয়ে বসে আছে। তার সামনে একটা পাত্রে একটু গাধার দুধ, বন্য ষেঁড়ীর তেল কিছু রয়েছে আর একটা গ্লাসে জন্তুর চর্বি, কিছু ঝামা, কাজল, মধু, বার্লি, হাড়ের গুঁড়ো আর মুগের ডাল সাজিয়ে বসে রয়েছে।

আমি চব্বিশ ঘণ্টায় যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারি, ফকির একটা টিনের চোঙ্গা মুখে দিয়ে চিৎকার করে বলছে, আসুন—চলে আসুন, বিনা পয়সায় ওষুধ দেব—

একটি বার্ধক্য জর্জরিত লোক এগিয়ে গেল।

তার কপালে বলীরেখা জ্বল জ্বল করছে। নীল শিরায় নকসাকাটা দুটো হাত। চামড়া ঝুলে পড়েছে। সে হেসে হেসে বলল, আমি বাবা বেশী বয়সে বিয়ে করেছি, বৌ মোটে ভালবাসে না—আমাকে—

ঠিক আছে, এখানে বসুন—বসুন, বিচিত্র সেই দরবেশ আবার হেঁকে বলল, আরও কে কে যৌবনকে ফিরিয়ে চান, যারা যারা সুন্দরী স্ত্রী কি

উপপত্নীর সঙ্গে জীবনটা উপভোগ করতে চান, তারা এগিয়ে আসুন—আরও তিন বুড়ো ভীড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এল।

ভাইসব শুনুন, রোমের সম্রাট নীরোর আস্তাবলে দুই হাজার গাধা ছিল। এই গাধা—

গাধা—গাধা কেন ?

গাধা দিয়ে হাল চাষ করতো ?

না-না ভাই, নীরোর ধর্মপত্নী পাপিয়া গাধার দুধ দিয়ে স্নান করতেন। গাধার দুধ দিয়ে স্নান করলে গায়ের রঙ ফরসা হয়, ফকির চোঙ্গ মুখে দিয়ে বিচিত্র বাণী দিতে সুরু করল, মাথায় মাথার সুগন্ধী তেলে গাধার পায়ের খুর আর খেজুর ফুল গরম করে পাক্কা সারের মত প্রস্তুত করে সেই তেল মাথায় মাখলে চুল হয় অটেল। সে চুল কখনো পাকে না—

আমরা গাধার পায়ের খুর কোথায় পাবো ?

কোথায় পাবো খেজুর ফুল ?

ব্যস্ত হবেন না ভাই—ব্যস্ত হবেন না—খোদাতালার এই দুনিয়ায় কোন জিনিসের অভাব নেই। শুধু জানা চাই—কি দিয়ে, কি হয়।

আচ্ছা—আচ্ছা ফকির সাহেব বলুন—আপনি পীরপয়গম্বর লোক আপনি যা বলবেন তাই শুনবো আমরা, বার্ধক্যভারে জীর্ণ বুড়োরা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে।

শুনুন—ভাইসব যৌবনকে ফিরিয়ে আনা, যৌবনকে অটুট রাখার প্রধান উপায় হচ্ছে প্রসাধন। খুব মনযোগ দিয়ে প্রসাধনচর্চা করুন, বলেই বক্তৃতারত ফকির হঠাৎ থামল। তার দুচোখে উৎসুক দৃষ্টি মেলে ধরে ভীড়ের ভেতরে কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

ফকির সাহেব কাকে খোঁজেন ? এই যে—এই যে আমি—নতুন বিয়ে করা বুড়ো মহোৎসাহে এগিয়ে এল।

না-না আপনাকে নয় আমার একজন পরিচিত লোক আসার কথা ছিল। হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল ফকির, আচ্ছা শুনুন—আপনি এদিকে এগিয়ে আসুন তো—

বুড়ো—সেই অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী এগিয়ে এল। তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল। উত্তেজনায়—তীব্র উত্তেজনায় তার মরা রক্তেও জোয়ার এল—

এখানে ঠিক হয়ে বসুন।

বুড়ো সুবোধ ছেলের মত পদ্মাসন হয়ে বসল।

এইবার কপালের যেখানে ত্রিবলীর দাগগুল্যো বেতের দাগের মত দপ দপ করছে সেখানে এই শাদা গুড়োটা লক্ষ্মী ছেলের মত মেখে ফেলুন তো—

ও মা—কিসের গুড়ো ?

গোরুর হাড়ের গুড়ো! দেখবেন, এই হাড়ের গুড়ো অর্থাৎ ভস্মচূর্ণ কপালে মাখলেই ত্রিবলীগুলো মিলিয়ে যাবে। তারুণ্যের জ্যোতি ফুটে উঠবে কপালে—

সব্বোনাশ গোরুর হাড়ের গুড়ো মাখতে হবে কপালে ' আমার ভেতর থেকে পৈতা টেনে বের করল, রেগে চীৎকার করে বলল, আপনি ব্রাহ্মণের ছেলেকে গোরুর হাড়ের গুড়ো মাখতে বলছেন! না-—না যৌবনের আমার দরকার নেই, একটা বদ্ধ উন্মাদের মত দুই হাত ছুড়ে চিৎকার করতে করতে বুড়ো ভীড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। মাটিতে একটা প্রচণ্ড পদাঘাত করল। আবার গলা ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, দামিনী যদি ভাল নাই বাসে—না বাসুক, যেখানে খুশি চরে থাক গে! আমি জানি, না—আমি ভাল করেই জানি যুবতী নারীর স্বভাবই সেই যে আমাদের দেশের মুনিঋষিরা বলে গিয়েছে—গাভী যে রকম নিত্যি নব নব তৃণ ভক্ষণ করে—

হো হো করা হাসির রোল পড়ে গেল জনতার ভেতরে।

ফকির গম্ভীর। তার চোখ দুটোয় সেই উৎসুক দৃষ্টি।

কাকে খুজছেন ?

আমারা সেই দোস্ত তো এল না, বিড় বিড় করে বলল ফকির, কি জানি—কোথায় মরছে—

আমি, ফকির সাহেব হাড়ের গুড়োই মাখবো, আর এক বুড়ো এগিয়ে এল। ফকির সাহেব কোন কথা বলল না।

তার মুখ গম্ভীর। বিষাদাচ্ছন্ন। মনের ভেতরে কিসের যেন আলোড়ন চলছে।

কি, ভাবছেন ?

কিছু না—

তাহলে দিচ্ছেন না কেন ওষুধপত্র ? বুড়ো ককিয়ে উঠল। ফকির ব্যস্ত

হয়ে বলল, আচ্ছা—আচ্ছা—এই নিন ঝামা। স্নানের আগে ঝামা দিয়ে গা ঘসবেন।

ঝামা দিয়ে গা ঘসলে গা ছড়ে যাবে যে।

আর এই নিন বার্লি!

বার্লি দিয়ে কি হবে?

দেহত্বক পরিষ্কার হবে, হঠাৎ ভীড়ের ভেতরে কাকে দেখে চিৎকার করে উঠল ফকির, শোন—শোন ভাই, তোমাকেই আমি সেই তখন থেকে, তোমাকে খুঁজছি—

জনতার দৃষ্টি পড়ল সেই লোকটির দিকে।

বাদামী রঙ। চোখদুটো নীল। বেঁটে খাটো। কিন্তু আমাদের দেশের লেপচা কি মঙ্গোলীয়দের মত নাক মুখ চ্যাপ্টা নয়। খুব চোখা নাক। পাতলা দুটো ঠোঁট।

কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি না ফকির। কোনদিন কোথাও দেখেছি বলে মনেও পড়ে না—

তুমি দেখনি। কিন্তু আমি দেখেছি ভাই। দেখার পর থেকেই মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ফকির দুহাতে বুক চেপে ধরে নিরুদ্ধ আবেগে চিৎকার করে উঠল, চল-চল তোমার ঘর কোথায়—

ঘর! লোকটির চোখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল, ঘর তো আমার নেই ফকির সাহেব, কেমন ভার ভার শোনালো গলার স্বর। আস্তে আস্তে বলল বহুদিন—বহুকাল আমি ঘর ছাড়া—

ফকিরের চোখদুটো ঝকমক করে উঠল। হেঁকে বলল জনতাকে, আগামীকাল আবার এখানে বসবো—যার দরকার সে আসবে—এখন আমাকে ছেড়ে দাও—

ভীড় কমতে শুরু করল।

ফকির তার জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে লোকটাকে সঙ্গে করে সমুদ্রের দিকে চলল। নির্জন বালুচরে এসে বসল দুজনে। বাদামী রঙের লোকটি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, কি বলবেন—ফকির সাহেব? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার অনেক কাজ আছে—

ফকির সাহেব মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে শুরু করল। একটা কথাও বলল না।

কি ভাবছেন ফকির সাহেব।

তোমার দুঃখ কি? তোমার যে কোন দুঃখ কি মনের ব্যাথা আমি যোগবলে দূর করে দিতে পারি।

সত্যি বলছো? লোকটির চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল, শোন আমার একমাত্র দুঃখ—বহুকাল—বহুদিন আমি ঘর ছাড়া, আমার বাড়ী যেতে খুব ইচ্ছে করে ফকির সাহেব—

তোমার ঘর কোথায়?

অনেক—অনেক দূর—

শুনিই না কোথায়?

মিলানে।

মিলান! ইটালীতে? তুমি তাহলে ইটালীয়ান?

হঁ্যা।

তোমার নাম কি?

জন মারিয়া।

তোমরা কালিকটে কি করো?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল মারিয়া এমন সময় হঠাৎ বালুচরের ওপর দিয়ে কয়েকজন লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। তাদের একজন চীৎকার করে ডাকল—মারিয়া—সাহেব—তুমি এখানে কি করছো—

আমি আসছি ফকিরসাহেব, খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল মারিয়া, আমার কারখানার লোকরা আমাকে খুঁজছে, হয়তো পিটার ডাকছে—

কারখানা!

পিটার।

সব তোমাকে বলব—কিন্তু—যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই হাতে বুক চেপে ধরে অসহ্য যন্ত্রনায় জ্বলেপুড়ে বলল, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না ঘরে আমার বৌ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে—উঃ কতদিন—কতকাল তাদের দেখিনি—বলেই দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেল।

কয়েকদিন পর।

ভাস্কার জাহাজে তার নিজস্ব কেবিনে পর্তুগীজ অফিসারদের মন্ত্রণা সভার বৈঠক চলছে। পর্তুগীজ সেনাপতি ভার্থেমা বলল, সর্বনাশ হয়েছে স্যার—

সে মনে মনে ভেবেছিল।

ভেবেছিল এই নেটিভ মেয়েটাকে সে বিয়ে করে ফেলবে। যদি রাজী না হয় তাহলে, জোর করে করবে। তখন বহু—বহু দূরে তার দেশের এক কোনে মমতাভরা গৃহাঙ্গনের কথা, প্রতীক্ষারতা একটি সুন্দর উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল মুখের কথা যে মনে হয়নি তা নয়।

কিন্তু কবে দেশে ফিরবে—ফিরতে পারবে। আদৌ আর ফিরতে পারবে কিনা কে জানে। রক্ত-মাংসে ভরা এই দেহটার দাবী তো মেটাতে হবে। তাই এই মেয়েটিকে তার বড় প্রয়োজন—

কাণ্ডটা ঘটে গেল ঠিক সেইদিন।

সেদিন হবো হবো সন্ধ্যার মুখে বেশ সেজেগুজে রওনা হয়েছিল কারাগারের দিকে। কাছাকাছি যেতেই একটা সেপাই ছুটে এসে তার পায়ের কাছে পড়েছিল। বলল, সাহেব মেয়েটা পালিয়েছে কাল রাত্রে—

কেন? তোমরা কি ঘুমুচ্ছিলে বলেই ঝক্ শব্দ তুলে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ফেলল।

না সাহেব আমাদের কোন দোষ নেই। কাল রাত্রি দুটো নাগাদ ওই মিলেনীজ সাহেবরা এসে বলল, তুই চাবি দে আমরা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব—আমি স্যার একটু ইতস্ততঃ করছিলাম তারপরে ভাবলাম—

তার কথা আর শেষ হলো না। ঝিলিক দিয়ে উঠল তলোয়ার। আর এককোপে হতভাগা সেপাইয়ের মাথাটা ধড় থেকে নেমে এল। তারপর সেই রক্তমাখা তলোয়ার নিয়ে ছুটল ওই দুই মিলেনীজ জন মারিয়া আর পিটার খ্যাণ্টনীর কাছে—

তোমরা মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েছো?

ওরা মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়ার চোখে ভয়ের ছায়া থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু পিটার বেশ স্পষ্ট আর বলিষ্ঠ স্বরে বলেছিল—হ্যাঁ দিয়েছি—আপনার যা খুশী করতে পারেন—

দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

আমরা পর্তুগালের রাজাকে বলবো, আপনার ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তার করার কথা, অথচ আপনি—

পিটার তার কথা আর শেষ করতে পারেনি।

তার হুকুমে তাদের দুইজনকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয়েছিল। আর সেই

যান্ত্রেই তাদের বিশেষ জাহাজে করে একেবারে কালিকটে নির্বাসিত করে দিয়েছিল। তার জীবনশত্রু—সেই দুইজন! জন মারিয়া আর পিটার অ্যান্টনি

কি ভাবছেন স্যার?

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল ভাস্কো। বলল, এবার বলো শয়তান দুটো কি করছে—তুমি কি কি খবর সংগ্রহ করেছো?

এইবার ভার্থেমা মাথা নীচু করল। আস্তে আস্তে বলল, কখনও ফকির সেজে কখনও বহুরূপী সেজে বহু কষ্টে যে খবর সংগ্রহ করেছি তা—হঠাৎ থেমে গেল বহুদর্শী সেনাপতি ভার্থেমা।

কি থামলে কেন?

আপনি শুনলে খুব উত্তেজিত হবেন—ক্রুদ্ধ হবেন স্যার—

এই মুহূর্তে বলে ফেল, না হলে এক কোপে তোমারই মাথা নামিয়ে ফেলব ভাস্কোর দুটো রক্তচোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। উত্তেজনায় দপ দপ করতে লাগল কপালের শিরাদুটো।

বলছি স্যার—বলছি—জন মারিয়া আর অ্যান্টনি পিটার পাথরের কারবারী—

ওটা পুরানো কথা—

তাই ওরা, গানপাউডারের ব্যবহার জানতো, কামান তৈরী করতেও জানত। জেমোরিন ওদের দিয়ে কামান তৈরীর একটা বিশাল কারখানা খুলেছে! প্রচুর কামান তৈরী করছে। আর—

আর কি—

জেমোরিনের অস্ত্রাগারেই শুধু সেই কামান রাখা হচ্ছে না। মালাক্কু, সিংহল মালাবার উপকূলের আশেপাশের রাজাদেরও সেই কামান সরবরাহ করছে পিটার অ্যান্টনির নেতৃত্বেই ওরা দলবদ্ধ হয়ে আমাদের ইণ্ডিয়া থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে—

ভাস্কো কথা বলল না। তার মুখে চিন্তার ছায়া নামল। তার চোখের সামনে একটি নিষ্ঠুর ও অনিবার্য সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ইণ্ডিয়ার এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে সে নিজেই একতাবদ্ধ করে তুলেছে তার নিরবচ্ছিন্ন—নির্মম অত্যাচার, সমুদ্র উপকূলের গ্রামগুলোতে লুঠতরাজ নারীধর্ষনের জন্যই দেশীয় রাজারা একজোট হয়ে তাদের ওপরে আঘাত করবে। দেখা যাক—

ভার্থেমা। তুমি আবার যাও কালিকটে। খুব ভাল করে জেনে এস ওদের প্রস্তুতি, কেমন ম্লান শোনালো দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ জলদস্যু ভাস্কোর কণ্ঠস্বর।

কয়েকদিন পর। আবার কালিকটের রাজপথে শোনা গেল সেই ফকিরের কণ্ঠস্বর—আসুন—আসুন—আসুন—চব্বিশ ঘণ্টায় যৌবন ফিরিয়ে নিন—

ফকিরসাহেব এসেছেন, মারিয়া এসে দাঁড়ালো গুটি গুটি।

ফকির খুব খুশী হল। যেন এই একটা মাত্র লোকের জন্যেই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল।

মারিয়া বলল, চলো তুমি বলেছিলে আমাদের ডেরায় যাবে চলো—

নিশ্চয়—তুমি না বললেও আমি যেতাম!

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন একটি মনোরম অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

মস্ত বড় দেউড়ী। তার দুইদিকে বন্দুকধারী দেশীয় সেপাই! দেউড়ী পার হলে মখমলের মত খুব নরম আর সবুজ ঘাস আচ্ছন্ন একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে সিঁদুর মাখা সিঁথির মত সুরকি বিছানো একটা সরু পথ ধরে যেতে হয় দালানের দিকে।

ফকির বেশ বুঝতে পারল, রাজ-অতিথিরাই এখানে থাকে। চারিদিকে দাসদাসীরা ছুটোছুটি করে কাজ করছে। কেউ পোষা ময়ুর, কবুতরের পরিচর্চা করছে, কেউ ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করছে।

মারিয়া ফকিরকে একটা সুসজ্জিত ঘরে বসালো। সঙ্গে সঙ্গে প্লেটে করে একছড়া মর্তমান কলা আর ডাবের সরবৎ নিয়ে এল পরিচারিকা—

নিন, আগে খেয়ে নিয়ে একটু জিরিয়ে নিন—

তোমার দুঃখ কি মারিয়া?

শুনুন যা বুঝতে পারছি, একটা বড রকম যুদ্ধ অনিবার্য। চারিদিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো। আবার বলল, জেমোরিনের হুকুমে কামান বন্দুকের কারখানায় সারাদিন-রাত কাজ চলছে—

কেন?

দেড মাসে চারশো বন্দুক তৈরী হয়েছে—

চারশো!

হ্যাঁ। পিতলের তৈরী দূরপাল্লার কামান তৈরী হয়েছে বারোটা-আর

তার কার্তুজ তৈরী হয়েছে একশো পাঁচটা। আর বন্দুকের মোল্ডের তে কথাই নেই—

এত অস্ত্র তৈরী হচ্ছে কেন ?

বুঝতে পারছ না—পর্তুগীজদের, ডাচদের তাড়াতে হবে যে, জেমোরিন মালাক্কার রাজা, ক্যাম্বোরের রাজা, সিংহলের রাজা একেবারে উঠে পড়ে আদা-জল খেয়ে লেগেছে কিনা, একটু থামল মারিয়া, ব্যথায় ছায়া থম থম করতে লাগল চোখে-মুখে। নিভু নিভু গলায় বলল, পর্তুগীজদের সঙ্গে নেটিভ রাজাদের যুদ্ধ একবার বাধলে আর কি আমরা দেশে ফিরতে পারব ? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—মারিয়া, পর্তুগীজরা ভ্যাম্পায়ারের মতো আমাদের—আমাদের রক্ত শুষে খাবে—

খুট্‌। পাশের ঘরে একটা সন্দেহজনক শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ছায়া পড়ল মারিয়ার চোখে।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল একটি তরুণী।

অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব। ভাটিয়ালী গানের সুরের মতো দীর্ঘ তন্বী চেহারা। সেই দেহে পেঁচিয়ে পরেছে নীলাম্বরী শাড়ি। গম্বুজের মতো বিশাল খোপায় চক্রাকারে পরেছে তাজা বেলফুলের মালা। তার আবির্ভাবের আড়ালে যেন হারিয়েই গেল তার ঘরখানা।

আপনারা চুপ করে গেলেন যে মারিয়া, হেসে হেসে বলল কমলালক্ষ্মী।

ফকির হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। দৃষ্টি ফেরাতে পারল না।

কমলালক্ষ্মী, অ্যান্টনি পিটার কোথায় ?

কে জানে বোধহয় রাজবাড়ীতে গিয়েছে, একটু থেমে বিরক্ত হয়ে বলল কমলালক্ষ্মী, সব সময় আপনি আমাকে পিটারের কথা বলেন কেন ?

মারিয়া অপ্রতিভ হলো।

আমি যাই মারিয়া, ফকির বলল, আপনারা কথাবার্তা বলুন—

আপনার পরিচয় তো জানা হলো না ?

দরবেশ ফকির উনি। পারস্যে বাড়ী। উনি সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ—দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য অনেক ওষুধ জানেন—

তাই নাকি! কমলালক্ষ্মীর চোখদুটো আগ্রহে জলজল করে উঠল।

ফকিরের মুখে বিনীত হাসি ফুটল। বলল, আপনি অপরিসীম সৌন্দর্যের অধিকারী। আপনার কাছে প্রসাধনের সম্বন্ধে আর কি বলবো?

তবুও বলুন না ফকিরসাহেব আরো সুন্দর কেমন করে হওয়া যায়, এই দেখুন আমার কপালে কেমন কালো কালো মেচেতার দাগ—

দেব আপনাকে একটা জিনিস--

কি ফকিরসাহেব?

আপনি বোধহয় জানেন না খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগেও মিশরে প্রসাধনের জন্য অদ্ভূত অদ্ভুত জিনিস ব্যবহার করার প্রচলন ছিল—

কি সেই সব জিনিস ফকিরসাহেব?

এখন বলব না। আপনাকে দেব আর একদিন। একটু থেমে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, আপনি জানেন—মিশরের রাজা তু—তুতানখামেনের কবর খোঁড়া হয়েছিল। দেড়হাজার বছর আগে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। মাটি খুঁড়ে দেখা গেল রাজার চেহারা একেবারে অবিকৃত আছে—অদ্ভুত সজীব আর স্নিগ্ধ—

হা—লা—লা—হা—লা—লা—বাইরে নেশাগ্রস্ত মানুষদের বেসুরো গলায় গান ভেসে উঠল।

কমলালক্ষ্মী একটা নীল প্রজাপতির মত হাওয়ার ওপর পা ফেলে বেরিয়ে গেল। হাওয়ায় একটা মিষ্টি সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। পিটার বেহেড মাতাল হয়ে এল, নীচের ঠোঁট চেপে ধরে বলল, মারিয়া এখন কমলালক্ষ্মী তার পাশে যেয়ে বসবে। তার পরিচর্যা করবে—কথাগুলোর ভেতরে একটা ঈর্ষার ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

ফকির খুশী হল।

বিদ্যুতচমকের মত তার মনে হল—মনে হল, অন্ধকারে যেন সে একটা আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে। হেসে বলল, মেয়েটি কে ভাই, জানতে পারি কি?

স্লেভ।

স্লেভ? কার স্লেভ—কে দিয়েছে?

আবার কার! রাজা জেমোরিনের। তিনি আমাদের দেখাশুনার ভার দিয়েছেন কমলালক্ষ্মীর ওপরে—

এমন সুন্দর মেয়েটাকে পেল কি করে?

জেমোরিন যখন বিজয়নগর রাজ্য জয় করতে গিয়েছিল তখন সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। অ্যান্টনি পিটারের সঙ্গেই ভাবটা খুব বেশী, একটু থেমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, শোন—আমার দেশে ফেরার কি ব্যবস্থা করছো ফকির সাহেব। এখানে যুদ্ধ বাধল বলে—একবার যুদ্ধ শুরু হলে আর দেশে ফিরে যেতে পারবো না—শেষের কথাগুলো কান্নার মত শোনালো।

ফকির সাহেব হাসল। সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, কেন ভাই, রাজ অতিথি তোমরা। প্রচুর টাকা মাইনে পাচ্ছো। রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর বাড়ীতে আর এমন সুন্দর সেবাদাসী।

এই মেয়েটার জন্যই তো এখান থেকে চলে যাবো—যেতে হবে—মারিয়ার চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত চক চক করতে লাগল—আমাকে কমলালক্ষ্মী ভালবাসলে হয় তো বাড়ীতে স্ত্রীর কথা ছেলেমেয়েদের কথা এতটা মনে হতো না কিন্তু—

তোমার সঙ্গেও তো বেশ হেসে হেসে কথা বলল মেয়েটা। মনে হল—তোমার সঙ্গে খুব ভাবসাব আছে—

সাপ-সাপ একেবারে সাপের জাত—তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল মারিয়া।

কি রকম ?

যেমন একদিনের ঘটনা বলি—জেমোরিনের হুকুমে ওর সমানভাবে আমাদের দু'জনকে সঙ্গদানের কথা। পিটারের কাছে যদি একরাত থাকে তো পরের রাত্রে আমার সঙ্গে থাকার কথা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। যতদূর তাকানো যায়, জ্যোৎস্নায় চারিদিক দিনমানের মত লাগছিল। কমলালক্ষ্মী সেজেগুজে আমার ঘরে এল। ওরা দাক্ষিণাত্যের মেয়ে। সাজতে ভালবাসে—

কিন্তু সেদিন দেখলাম কমলালক্ষ্মীর মুখ ভার ভার—

কি হয়েছে তোমার ?

কিছুই বলল না। মাথা নীচু করে বসে রইল। আস্তে আস্তে বলল, আমার আর এরকম জীবন একেবারে ভাল লাগছে না—আজ তোমাদের মনোরঞ্জন করবো আবার কালই হয়তো অন্য কোথাও—আর কারো কাছে পাঠিয়ে দেবে—কালই—বলতে বলতে তার চোখদুটো জলে ভরে এল।

আমার মনটা কেমন হয়ে এল। আমি বললাম, বলো কমলালক্ষ্মী আমি তোমার জন্য কি করতে পারি—

চলো আমরা পালিয়ে যাই, ফিস ফিস করে চোখে জল নিয়ে বলেছিল সে, আমরা সমুদ্রের ধারে কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধবো—তুমি আমি দুজনে মিলে কারখানা—একটা বন্দুকের কারখানা তৈরী করবো—

ফকির সাহেব আমার মনে হয়েছিল, আমি গান--গান শুনছি—সেই রাত্রে কমলা নিজেকে আমার কাছে একেবারে উজাড় করে দিয়েছিল—

আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম—সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল রাত্রি দুটোর সময়। ঘুম ভেঙ্গে দেখি, পাশে কমলালক্ষ্মী নেই—

আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমি ছুটে বাইরে এলাম। নিশি রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমাদের বাড়ীটার চারিদিকে জ্যোৎস্না থই থই করছে।

পিটারের ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। জানালা খোলাই ছিল। দেখলাম—এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল মারিয়া—অসহ্য আর তীব্র একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তার মুখে। খুব তিক্ত স্বরে বলল, এখানে শুধু বন্দুক কামানের কাজ, শুধু যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা ষড়যন্ত্র। আমাকে—আমাকে যদি এখানে থাকতে হয় তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে—

ফকির কোন কথা বলল না।

মনে হল মারিয়ার দুঃখে ব্যথিত হলো। খুব নীচু স্বরে বলল, তুমি শেষরাত্রে কালিকটের বন্দরের উত্তরদিকে তিন মাস্তুলওয়ালা জাহাজটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বলেই হন হন করে পা চালিয়ে চলে গেল ফকির।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জন মারিয়া।

কে এই ফকির বন্দরে জাহাজের কাছে যেতে বলল! দরবেশ ফকির ভবঘুরে মানুষ, জাহাজ পেল কেমন করে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো? হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল কমলালক্ষ্মী।

কিছু না—বলেই নিজের ঘরে এসে দড়াম করে খিল লাগিয়ে দিল জন মারিয়া। তার সন্দেহ হলো, কমলা আড়ি পেতে সব শুনেছে—

শেষরাতের অন্ধকার ঝিকমিক করছে সমুদ্রের জলে।

তিনমাস্তুলওয়ালা জাহাজের সামনে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে ফকির ওরফে ভার্থেমা।

ধীরে ধীরে পূবের আকাশে ভোরের রেখা জাগছে। এখুনি—এখুনি

সকাল হবে। জেগে উঠবে বন্দরের ব্যস্ত জীবন। এখনও—এখনও মারিয়া আসছে না কেন। ঠিক সময়ে এলে এতক্ষণ আরব সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে কোথায় কতদূরে চলে যেত।

হঠাৎ নির্জন বন্দরে পদশব্দ বেজে উঠল।

জন মারিয়া এল না।

এল এ্যান্টনি পিটারের নেতৃত্বে জেমোরিনের চারশো সশস্ত্র সৈন্য। প্রত্যেকের কাঁধে বন্দুক। বন্দুকের সঙ্গীণে নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরোয়ানা ঝকমক করছে। ভার্থেমার জাহাজ থেকেও গোলন্দাজ সৈন্যরা কামান ছুঁড়তে লাগল।

শুরু হল তুমুল যুদ্ধ।

দুইপক্ষ থেকে গোলা বর্ষণ হতে লাগল। নিহত সৈন্যের রক্তে লাল হয়ে গেল সমুদ্রের জল। একটু পরেই জেমোরিনের সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু হলো। পর্তুগীজদের কামান অত্যন্ত শক্তিশালী। গোলন্দাজ সৈন্যরা যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ। তাদের প্রচণ্ড আক্রমনের সামনে কালিকটের সৈন্যরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়ে পর্তুগীজদের জাহাজ দূর সমুদ্রবক্ষে উধাও হয়ে গেল। হারিয়ে দিয়ে চলে গেল।

চলে গেল বৃহত্তর প্রস্তুতির জন্য।

ভার্থেমা ভাস্কোকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল!

ভাস্কো চিন্তিত হলো! একটু পরেই গোয়ায় পর্তুগীজ ভাইসরয়কে চিঠি লিখল—আরও বেশী গোলন্দাজ সৈন্য চাই, আরও কামান চাই। মনে হয় পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কালিকটের রাজা জেমোরিনের নেতৃত্বে কান্নোর মালাক্কা, কোচিন সিংহল ও বিজয়নগরের দেশীয় রাজারা একজোট হয়ে দাড়াবে। ইণ্ডিয়া থেকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে ···

ভাস্কোর অনুমান সত্য হয়েছিল।

কালিকটে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। জেমোরিন নিজে ঝড়ের মত কান্নোর থেকে মালাক্কা, সিংহলে, বিজয়নগরে মালাবারে ঘুরে ঘুরে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে উত্তেজিত করেছিল। বহুদর্শী রাজা জেমোরিন সেই সুদূরকালে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেয়েছিল—এই বণিকথেকো বিদেশীদের আরও প্রশ্রয় দিলে একদিন ওরা এদেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসবে অতএব—

কামান বন্দুদের কারখানায় আরও শত শত কারিগর নিয়োগ করা হলো। জন মারিয়া নজরবন্দী। তার সামনে তুই রক্ষী, পিছনে তুইরক্ষী। সে সেই অবস্থায় বন্দুকের কার্তুজ তৈরী করছে। এ্যাণ্টনি পিটার নিজে দাড়িয়ে থেকে কামান তৈরী করাচ্ছে। তার কাছেই লোহার তৈরী জেমোরিনের বিশাল অস্ত্রাগারের চাবি। আসন্ন বড যুদ্ধের জন্য যত কামান বন্দুক কার্তুজ তৈরী হচ্ছে সমস্ত সেই অস্ত্রাগারে সাজিয়ে রাখছে কুলীরা। একটা খাতায় হিসাব রাখছে খাজাঞ্চি।

দিন কাটে। মাস কাটে। আগ্নেয়াস্ত্রে ভরে ওঠে অস্ত্রাগার। ওদিকে দেশীয় রাজারা হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে কালিকটে। জেমোরিন জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

পর্তুগীজরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই।

তাদের উপনিবেশ মাহেতে ওদের দুর্গকে সুরক্ষিত করে তুলছে। পর্তুগাল থেকে, স্পেন থেকেও হাজার হাজার সৈন্য আসছে মাহেতে। জেমোরিন পাঁজী দেখছে— যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য শুভদিন দেখছে। ঠিক এমন সময়—

এমন সময় ঘটে গেল কাণ্ডটা।

আর সেই অপঘটনার জন্যই পাল্টে গেল ভারতবর্ষের ইতিহাস। এত বড সেই দুর্ঘটনার আডালে কে ছিল।

অ্যাণ্টনী পিটার।

কমলালক্ষ্মী।

তারা তুইজন স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে সেই প্রাসাদতুল্য বাডীতে আর সেই প্রাসাদের এক কোণে একটা—একটা অন্ধকার শ্বাসরোধী ঘরে নজরবন্দী হয়ে থাকে জন মারিয়া। সে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নিশি রাত্রে আর অদূরে পিটারের বন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে ওঠে। উত্তেজনায় প্রতিহিংসায় কেমন অমানুষিক হয়ে ওঠে। কিন্তু—

একদিন পরিস্কার কান্নার শব্দ শুনতে পেল। কমলালক্ষ্মী কাঁদছে।

দারোয়ান রক্ষী পরিচারিকা মারফৎ আসল খবরটা বেরিয়ে পডল। কমলালক্ষ্মী দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছে। প্রতীক্ষা করেছে পিটারের শুধু একটি—একটি মাত্র মুখের কথার জন্য—অবশেষে সেই প্রতীক্ষার কালও শেষ হয়েছে। চার্চে গিয়েছে। বাইবেল পডিয়ে পাদ্রী বিয়েও দিয়েছে। মাত্র এক মাস আগে। কিন্তু—

সাগরপারের মানুষ। নেটিভ মেয়েদের উপভোগের উপকরণ বলেই জানে। তাদের স্ত্রীর সম্মান দিতে বড একটা দেখা যেত না। কমলালক্ষ্মী সুন্দরী হতে পারে। দাসী ছাড়া আর কিছু তো নয়। তার উপর আকর্ষণ কমতে দেরী হলো না। হিংস্র বাঘিনীর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কমলালক্ষ্মী। সেদিন বর্ষা নেমেছিল।

ভিজে ভিজে হাওয়ায় কামান বন্দুক তৈরীর কাজ ভাল হয় না। তাই বহুদিন পর পিটারকে দুপুরে বাড়ীতে পেয়েছিল। সোজা পিটারকে বলল, কেন তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছো?

কি করেছি—

তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না—রাত্রে মদ খেয়ে বেঁহুস হয়ে পড়ে থাকো—তোমার পাশে আমি যে শুয়ে থাকি—কিছু বলল না পিটার।

কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো কমলালক্ষ্মীর দিকে। তীক্ষ্ণস্বরে বলল, তোমাকে আর একটুও ভাল লাগছে না, একটু থেমে বলল, দেখ লক্ষ্মী দীর্ঘ সাত বছর ধরে শুধু কালো মেয়ে দেখে দেখে একেবারে অরুচি ধরে গেছে—আমি একটা—একটা যেমন তেমন সাদা রঙের মেয়ে দেখার জন্য পাগল হয়ে গেছি—

কেন—আমিও তো তরুণী—যুবতী—বলেই হঠাৎ নিজে টান মেরে খুলে ফেলল ব্লাউজ, খুলে ফেলল কাঁচুলী। নিজের দেহসম্ভার মুহূর্তে অনাবৃত করে মেলে ধরল—তীব্র ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল, তোমার সাদা রঙের মেয়ের মত এই দেখ—আমার সবই আছে—দেখ—দেখ—বলেই একতাল কাদার মত পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পিটার বুটজুতা পরা পা দিয়ে মারল একটা লাথি!

সঙ্গে সঙ্গে ঘাখাওয়া বাঘিনীর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো কমলালক্ষ্মী। ঘর থেকে অস্ত্রাগারের চাবিটা নিয়ে ছুটে গেল ঝড়ের মত! চিৎকার করে বলল, আমার সর্বনাশ করেছো—আমি তোমার সর্বনাশ করবো—

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

সেই বৃষ্টি মাথায় করে কমলালক্ষ্মী বাইরে এল। বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মত এল সমুদ্রের ধারে। বৃষ্টিতে ঝড়ো বাতাসে সমুদ্র তখন উত্তাল হয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। একটি জেলেকে প্রচুর বখশিস দিয়ে তার নৌকো করে চলল পর্তুগীজ উপনিবেশ মাহের থেকে আশী মাইল দূরে একটা খালের ধারে।

কমলালক্ষ্মী জানতো এখানে ভাস্কোর অনুচর বোম্বেটেদের ছিপ নৌকোর ঘাঁটি আছে।

ওদিকে অ্যান্টনি পিটারও তার লোকজন নিয়ে ছুটে এল সমুদ্রের ধারে। চিৎকার করে ডাকল—ক-ম-লা-ল-ক্ষ্মী—আ-ল-মা-রীর চাবিটা দিয়ে যাও—তার হাঁকটা ঝড়ো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বহু—বহু দূরে মিলিয়ে গেল। কোথায় কমলালক্ষ্মী? সে তখন দুর্যোগের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে একটা বিন্দুর মত মিলিয়ে গিয়েছে।

সেইদিনই সারা দুপুর জেমোরিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অস্ত্রাগারের লোহার দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করল। বহু লোকজন দিয়ে লোহার তৈরী ঢেঁকীর সাহায্যে ঘা দেওয়া হলো দরজায় কিন্তু কিছুতেই দরজা খোলা গেল না। ওদিকে শত শত ছিপনৌকোয ভাস্কোর আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত হাজার হাজার সৈন্য এসে পড়ল।

তারপর—তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

মাত্র কয়েকটা বন্দুক ও কামান জেমোরিনের নিজের প্রাসাদে ছিল। সেই কয়েকটি দিয়ে যতক্ষণ পারল লড়াই করল কালিকটের সৈন্যরা। আর হাজার হাজার নিরস্ত্র সৈন্য কামানের তোপের মুখে পিঁপড়ার মত মরতে লাগল!

কালিকট শহরে প্রবেশ করেই ভাস্কো প্রথমেই দুই চরম শত্রু—মারিয়া আর পিটারকে গুলী করল। তারপর চলল নির্বিচার হত্যা, লুন্ঠন ও নারী ধর্ষণ!

পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত গেল।

চারিদিকে অন্ধকার নামল। আর সেই সঙ্গে জেমোরিনের দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকুল থেকে দুষ্টক্ষতের মত পর্তুগীজ বোম্বেটেদের নিশ্চিহ্ন করার স্বপ্নও মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল একটা স্নেহ—একটা দাসীর জন্যে।

নাম্বিয়ারের ইতিহাসে শুধু জন মারিয়া ও পিটারের কথা বিশদ ভাবে আছে আর সেই বইয়েরই ফুট নোটে আছে কমলালক্ষ্মীর কথা—An woman slave divulged the plan to Vasco-de-gama.

থামল আলবুকেরুথি।

কমলালক্ষ্মীর নামটাই তো ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা উচিত ছিল দাদু—

—দিদিমনি, নীচে তোমাকে কে ডাকছে? চাকর এসে খবর দিল। মার্থা চলে গেল।

স্লেভট্রেডের ওপরে এই বইটা ওর ছুটির ভেতরে শেষ হলো না বলে ওর খুব আক্ষেপ আলবুকেরুখির মনে হল, কেন ওর এত ইণ্টারেষ্ট—ওর দেহের শিরায় শিরায় রক্তখেকো জলদস্যু রক্ত বয়ে চলেছে বলে?

তেইশ বছর আগে যখন সে বোম্বে পোর্টে কাজ করতো, সেই পুরানো দিনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো যেন তার মনের ভেতরে মিছিল করে যেতে লাগল—

গোয়ানীজ নাবিক পেড্রোর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই সূত্রে তার বাড়ীতে যাওয়াআসা করতে করতে পেড্রোর স্ত্রী লরার সঙ্গেও তার ঘনিষ্টতা হয়েছিল।

তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে ছিল দুরকম। পেড্রো ছিল সংসার উদাসীন। সমুদ্রে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারলে খুশি হতো। আর লরা ছিল খুব বুদ্ধিমতী তাদের সাতটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে সেই সামলে সুমলে রাখতো—

পেড্রোর অনুপস্থিতিতে ছেলেমেয়ের খোঁজখবর করতো সে তাই লরার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সে তাকে একান্ত আত্মীয়ের মত মনে করতো।

একদিন হঠাৎ দুপুরে গিয়েছিল সে। দেখল, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে। আর লরা একমনে একটা মোটা খাতায় খস খস করে কি লিখছে। নুন আনতে তেল ফুরিয়ে যাওয়া সংসারের এত ঝক্কি সামলেও লরা লেখাপড়া করে নাকি।

লরার মা নাকি কোন এক খাস পর্তুগীজ সাহেবের কাছে বহুদিন ছিল পেড্রো তাকে একদিন বলেছিল। অতএব লেখাপড়া এবং বিলেতী আদব-কায়দাটা জানাই স্বাভাবিক।

কি করছেন? পিছন থেকে আচমকা বলতেই লরা খাতাটা লুকিয়ে ফেলেছিল—ব্যস্ত হয়ে বলল, ও কিছু না—ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে—সময় আর কাটতে চায় না। তখন যা খুশি তাই হিজিবিজি করি—

সে কিছু বলে নি। কিন্তু কৌতুহলে মনের ভেতরটা জলে যেতে লাগল। আকস্মিক একটা দুর্ঘটনায় খাতা তার হাতে এসে পড়েছিল।

তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ লরা মারা গেল। পেড্রো চোখে দিশেহারা দেখল। তার স্ত্রী ডলির কাছে এসে বলল, বৌদি কোলের মেয়েটাকে আপনি রাখুন—আমার কাছে থাকলে মরে যাবে—

আর তাকে দিয়েছিল লরার সেই খাতাটা—বলেছিল পেড্রো, লরা

তোমাকে দিতে বলেছে—সে চলে যেতেই খাতাটা খুলেছিল আর প্রথম লাইনটা দেখেই চমকে উঠেছিল—

সেইদিন—সেইদিন থেকে যক্ষ্মার জীবাণুর মত তাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছিল একটা বাসনা—স্লেভ ট্রেডের ওপর একটা প্রামানিক ইতিহাস লিখতে হবে—অমর করে রাখতে হবে চিত্রা পাটার্নকে ডোরা র‍্যারলোকে আর আনাম মোস্লেসকে—অসহ্য—অসহ্য অস্থিরতায় তার হাতের আঙুলগুলো নিসপিস করে উঠল।

॥ ছয় ॥

শুধু পর্তুগীজরাই এদেশে আসে নি। এদেশের অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের লোভে সাগরপার থেকে এসেছিল ইংরেজ, এসেছিল ফরাসী, এসেছিল ডাচেরা। কিন্তু সবচেয়ে আগে এদেশের মাটিতে পা দিয়েছিল পর্তুগীজরা। তবুও কেন ইংরেজদের মত তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না—আলবুকেরুখি ভাবে। দুঃসাহসী পর্তুগীজ নাবিকরা ছিল বাঘের চেয়েও হিংস্র আর রক্তলোলুপ। ওরা শুধু জানতো বন্দুক আর তলোয়ার। নির্বিচারে খুন, লুঠতরাজ, রাহাজানি, নারীধর্ষণ ছিল তাদের নেশা। এদেশের সুগন্ধী মশলার সৌরভে কখনো মুগ্ধ হয় নি তারা। কখনো ভারতের হিমগিরির মহিমার দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকাতে পারে নি। সিন্ধু-গঙ্গা-নর্মদা-কাবেরীর তরঙ্গের ভাষা বুঝতে চায় নি। তারা শুধু গঞ্জে গঞ্জে গড়েছিল কুঠি, বন্দরে বন্দরে গড়েছিল দুর্গ। মেতে উঠেছিল জীবন্ত পণ্যের ব্যবসায়ে—এসবই কি কারণ? ভাবতে ভাবতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা সুন্দর মুখের ছবি।

টানা টানা ঘন নীল দুটো চোখ। আপেলের মত গায়ের রঙ! গালের দুপাশে তামাটে রঙের চাপ দাড়ি।

এ্যাব্রাম জ্যাকুইট।

একজন হতভাগা। অর্থাৎ স্লেভ। জাতে ইহুদী, লিসবনে যেমন কাফ্রী দাস, আরব দাস চালান হয়ে যেত তেমনি ভাগ্যচক্রে এসে পড়েছিল এক ইহুদী দাস।

তার জায়গা হলো লিসবনের রাজপ্রাসাদে। রাণীর এবং সখীদের খুব প্রিয়পাত্র। সুন্দরী পরিচারিকাতে গিজ গিজ করছে প্রাসাদ। তাদের সঙ্গে

হাসি মস্করা করে। কিন্তু কোন মেয়েই ওর মনের কোন থৈ পায় না। জ্যাকুইটের হাবভাব চালচলন অদ্ভুত।

নিশি রাত্রে অজস্র তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে তারাদের কি রহস্য খোঁজে কে জানে।

নির্জন দুপুরে খড়িমাটি দিয়ে তার নিজের ঘরের মেঝেতে কি সব আঁক-জোঁক করে। আপন মনে ফিক ফিক করে হাসে। মেয়ে মহলে গুঞ্জণ ওঠে—জ্যাকুইট-ইহুদী স্লেভটা পাগল বোধহয়—

পাগল নয়। তার প্রমান পাওয়া গেল কিছুদিন পরেই।

ভাস্কো-ডি-গামা সমুদ্র যাত্রা করছে। লিসবনের দিকে দিকে চাঞ্চল্য জেগেছে। ভাস্কো চলেছে ভারত অভিযানে। ভারত অর্থাৎ ইণ্ডিয়া—সোনার দেশ!

কোন সুদূর অজানা দেশ ইণ্ডিয়ার বিপুল সম্পদের কথা লিসবন, মাদ্রিদ, প্যারিস, বার্লিন ইত্যাদি ইউরোপের বড বড় শহরের মানুষের মনে রূপকথার গল্পের মত বিরাজ করে। কিন্তু—

কেউ জানে না কোন মহাসাগর পাডি দিয়ে কোন দিক গেলে পাওয়া যাবে সেই আশ্চর্য দেশ। ডাচরা চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে ফরাসীরা চেষ্টা করেছে ইংরেজরা। কেউ পারে নি।

লিসবনে তখন রাজত্ব করছেন জেম ম্যানোয়েল। পর্তুগালের নৌশক্তি তখন পৃথিবীর যে কোন দেশের নৌশক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দশ বছর আগে ডন জোয়ান যা পারেনি। সে তাই করবে। করতেই হবে। ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা তাকে পাগল করে তোলে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন দুঃসাহসী নাবিক ভাস্কোকে পাঠাবেন ইণ্ডিয়ার পথ আবিষ্কারে।

ভাস্কো-ডি-গামার সমুদ্র যাত্রা উপলক্ষ্যে রাজসভা বসেছে। পণ্ডিত, ইতিহাসবিদ, সমুদ্র বিজ্ঞানবিদ, প্রাণীবিদ্যাবিশারদ ভূগোলবিদ এবং রাজ্যের বহু গুণীজন সভা আলো করে বসে আছে।

নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে আর খরচ-পত্তর করে কাজ নেই। এই তো সুদক্ষ নাবিক বার্থোলোমিউকে এত বড় নৌবহর দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। ঝড়ে সমুদ্রের কোন দিগন্তে তা উধাও হয়ে গেল—

তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে নাকি? রাজা বললেন,

আমরা সেই সোনার দেশ আবিষ্কার করব, সেখানে উপনিবেশ গড়বো, তার কথার ভেতরে এক অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠে।

সভার কাজ চলছে। প্রচুর বাকবিতণ্ডা হচ্ছে। হঠাৎ অন্দরমহলের দেউড়ীতে একটা কিসের যেন গোলমাল শোনা গেল।

তুই—তুই ব্যাটা স্লেভ—

তুই রাজসভায় কেন যাবি, তুই তো শালা মেয়েমহলের খানসামা—

প্রহরীরা চিৎকার করছে। যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে এল। রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, ইহুদী দাস অ্যাব্রাহাম জ্যাকুইট। কেমন উদভ্রান্ত চোখ মুখ। বিড় বিড় করে কি বকছে।

কী চাই?

মহারাজ মহামান্য নাবিক ভাস্কো ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, দূরে দরবার কক্ষের গায়ে আঁকা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবির দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলতে শুরু করল—ইণ্ডিয়ার পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হবেন—

সমস্ত সভা স্তব্ধ।

আর একটা কথা স্মরণ রাখবেন বার্থোলোমিউ ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার কারণ হলো বড় বড় জাহাজ। বড জাহাজ সমুদ্রের ঝড়ে সহজেই কাবু হয়ে পড়ে। আমার অনুরোধ ভাস্কো যেন ছোট ছোট তিনটি জাহাজ নিয়ে রওনা—

সভায় কারো চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

প্রত্যেকের স্থির দৃষ্টি সেই বিচিত্র ইহুদী স্লেভের উদাস সুদূর নীল চোখ-দুটোর দিকে নিবদ্ধ।

ভাস্কো যে সমুদ্র অতিক্রম করবে—সেই সমুদ্র পৃথিবীর ভেতরে সবচেয়ে বড় সমুদ্র, তার একদিকে শীত আর একদিকে খুব গরম—

সভায় সকলে যেন কোন অচিনপুরের রূপকথা শুনছে।

উত্তর দিকের আকাশে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে জাহাজ চালাতে হবে—

কিন্তু আকাশকে বিশ্বাস নেই। যদি মেঘে ঢেকে যায়? মহারাজ তার জন্য আমি এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছি অনেক মাথা খাটিয়ে, বলেই জ্যাকুইট কাঠি দিয়ে তৈরী একটা ক্রশের মত কি একটা বের করল।

জিনিসটা আর কিছুই নয়। আধুনিক যুগের 'কম্পাসের' আদিম সংস্করণ।

রাজা জেম ম্যানোয়েল খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন—ভাস্কোর ভারত অভিযানে এ্যাব্রাহাম জ্যাকুইট সঙ্গী হবে।

ভাস্কো কোন আপত্তি করল না। আরও বেশী করে যাত্রার তোড়জোড় শুরু হলো।

১৪৯৭ সাল—

লিসবনের বন্দর। সামনে ধূ ধূ করছে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। আর পিছনে আর এক সমুদ্র—জনসমুদ্র! যতদূর তাকানো যায় গিজগিজ করছে লোক। সারা শহর যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

ভাস্কো যাত্রা করছে।

সারি সারি তিনটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে।

গ্যাব্রিয়েল।

র‍্যাফেল।

কারভেল।

যেন এক মায়ের পেটের তিন বোন। একরকম দেখতে—একরকম সাইজ। কিন্তু তাদের ওজনের তারতম্য ছিল। গ্যাব্রিয়েল দেড়শো টন আর র‍্যাফেল এবং কারভেল যথাক্রমে একশো টন আর পঞ্চাশ টন।

এসবই জ্যাকুইটের নির্দেশ। জাহাজ হবে ছোট এবং একই মাপের। হঠাৎ যদি কোন 'পার্টস' ভেঙে যায় তাহলে অন্য জাহাজের পার্টস নিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাবে—

এরপর—

অকুল দরিয়ায় ভাসল ভাস্কো!

দিনের পর দিন কেটে যায়। আকাশ পরিস্কার। আবহাওয়া ভাল। ভাস্কোর মনে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু যেই 'কেপ কমোরিন' এগিয়ে, আসতে লাগল ততই ভাস্কোর মুখে চিন্তার ছায়া ঘন হতে শুরু করল।

কেপ কমোরিন।

টলেমি বলেছেন 'স্টর্মি কেপ' কিম্বা 'কেপ অফ স্টর্মস'—

ভাস্কো চিৎকার করে ডাকল—জ্যা-কু-ইট—কোথায় তুমি?

কেউ সাড়া দিল না।

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সেই বিচিত্র চরিত্রের ইহুদীকে।

যেখান থেকে পারো নিয়ে এস জ্যাকুইটকে—নাবিকদের হুকুম করল ভাস্কো।

ভাস্কোর দুচোখে আগুন ঝরতে লাগল। ক্রুরা জানে, গামা রেগে গেলে আর মানুষ থাকে না। আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করল।

ওদিকে একটু একটু করে কেপ কমোরিন এগিয়ে আসছে। এখুনি ঠাণ্ডা পড়বে। সূর্যের আলো কমে যাবে। না—

স্লেভটা গেল কোথায়? ক্রুদ্ধ বাঘের মত জাহাজের ডেকে পায়চারী করতে লাগল ভাস্কো।

হঠাৎ ক্রুদের চিৎকার শোনা গেল—স্লেভটাকে পাওয়া গেছে—স্লেভটাকে পাওয়া গেছে স্যার—

চার পাঁচজন পিঠ মোড়া করে বেঁধে নিয়ে এল জ্যাকুইটকে। কোথায় ছিলে তুমি?

কোন উত্তর দিল না এ্যাব্রাহাম।

চোখের দৃষ্টি সুদূর। গম্ভীর মুখ। যেন কোন অজানা দেশে তার মন ঘুরছে।

কী ব্যাপার তুমি উত্তর দিচ্ছো না কেন?

এবারও কোন সাড়া দিল না সেই ইহুদী। প্রত্যেকটি ক্রু ওর ঔদ্ধত্য দেখে একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্যার ওর হাতে কি সব কাগজপত্র দেখা যাচ্ছে—সহকর্মী ভিনিসেণ্ট সোড়ে চিৎকার করে উঠল।

জ্যাকুইট হাতদুটো পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গামা সেই হাতের ভেতর থেকে টান দিয়ে বের করল কী সব হিজিবিজি লেখা কাগজ। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। তবুও রক্তচক্ষু মেলে কাগজটা দেখল।

সূর্যের ছবি।

বিশাল সমুদ্র। তার মাঝখানে একটা রেখা। তার একদিকে কালো—ঘন কালো রঙ! আর একদিকটা খুব উজ্জ্বল।

এ সব কিসের ছবি, হিংস্রজন্তুর মত গর্জন করে উঠল ভাস্কো—

আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা করুন গামা—আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি—শুনুন, এই রেখাটা হলো কেপ কমোরিন! এই লাইনের ওপার থেকে সূর্য একটু

একটু করে সরে আসছে। যত সরে আসছে তত সেখানে দিনের দৈর্ঘ কমে আসছে, আর সেখানে বেশী ঠাণ্ডা পড়ছে। সেই অন্ধকার ঠাণ্ডা জায়গাটায় যেই হু হু করে শীতল বাতাস বইতে শুরু করে, অমনি আকাশে থরে থরে মেঘ জমে ওঠে আর ঝড় আসে—

তারপর ?

এখন যদি নাবিকরা জানতে পারে প্রত্যেকদিন সূর্য কতটা কমছে, তাহলে কখন ঝড়ের মুখে পড়বে তা জানতে পারবে—

বাঃ—বাঃ—আনন্দের আতিশয্যে ভাস্কো জ্যাকুইটকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরল। বলল, ইণ্ডিয়াতে যেতে পারলে তোমার সারা গা সোনা দিয়ে মুড়ে দেব জ্যাকুইট—তোমাকে আমার ঈশ্বর করে রাখবো—

ভিন্সিসেণ্ট সোড্রের চোখদুটো ঈর্ষায় জ্বলে উঠল।

দিন কাটে। জাহাজ কেপ কমোরিনের দিকে এগিয়ে যায়। জ্যাকুইট অঙ্ক কষে কষে বলে সূর্য কতটা এদিকে সরে আসছে। কতটা এগিয়েছে তারা—

ভাস্কোর একদণ্ড চলে না আব্রাহামকে ছাড়া—

কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। ঠিক যেদিন জাহাজ কেপ কমোরিনে প্রবেশ করল, সেইদিন খুব ভোরে আকাশে ঝড়ো মেঘ দেখে ভাস্কো ছুটতে ছুটতে এল এ্যাব্রাহাম জ্যাকুইটের কেবিনে। কিন্তু কেবিনের ভেতরের দৃশ্য দেখেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

মেঝেতে হতভাগ্য অ্যাব্রাহাম জ্যাকুইটের দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হঠাৎ কেবিনের তক্তাপোষের নীচে পড়ে গেছে। একটা টিনের বালতির কোনায় লেগে কেটে গিয়েছে—সেখানে রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে। তার ওপর পিঁপড়ার সারি গুটি গুটি এগিয়ে আসছে—দু' একটা আরশোলাও রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে। কিন্তু দেহের কোথাও এতটুকু আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু চোখ দুটো ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মনে হয় লোহার শিক গরম করে—সেই উত্তপ্ত শিক দিয়ে চোখ দুটো ফুটো করে দিয়েছে। আর সেই যন্ত্রণায় মারা গেছে।

ভাস্কো তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে তার বুকে, নাড়ীতে হাত দিয়ে দেখল প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে—

কী আশ্চর্য! খাটের ওপরে ঘরের আশে পাশে ছড়িয়ে আছে শুধু রাশি

রাশি কাগজ। সেই কাগজে আছে অঙ্ক। আর ছোট একটা টেষ্টটিউবের মত কাঁচের নল—

ভাস্কো বুঝতে পারল না—ওটা কি, আর তখন তার বোঝার মত মনের অবস্থাও ছিল না—রাগে ক্ষোভে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল কে এই সর্বনাশ করেছে—

ক্রুদের কাউকে দিয়ে কিছু কবুল করাতে পারল না। তাদের প্রত্যেককে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল ভাস্কো। বলল, বলো—অনুগ্রহ করে বলো কার সঙ্গে কি শত্রুতা করেছিল জ্যাকুইট? অনিশ্চিত সমুদ্র যাত্রার কত বড় সহায় ছিল, বলতে বলতে ভার ভার হয়ে উঠল কঠিন-হৃদয় ভাস্কোর গলার স্বর। পরম মমতায় জ্যাকুইটের আঁকি বুকি করা কাগজ পত্র বুকে জড়িয়ে ধরল। রোশে ক্ষোভে উত্তেজনায় নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে লাগল। যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে বলল, এখন আমি রাজাকে কি বলবো—

ক্রুদের ভেতরে কেউ কোন কথা বলল না। শুধু সোড্রের চোখদুটো সাপের জিভের মত চিক চিক করে উঠল।

ভাস্কো জানতো, রাজা জেম ম্যানুয়েল এবং তার খুব প্রিয় পাত্র হলো কিনা এক ব্যাটা ইহুদী স্লেভ! তাই ক্রুরা জ্যাকুইটকে সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু সহকর্মী নাবিকদের আর বেশী কিছু বলতে সাহস করল না।

বিপদসঙ্কুল এই সমুদ্র যাত্রা।

যদি ওরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে!

জ্যাকুইটের মত অসাধারণ গুণীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ভেতরে একটা সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, পর্তুগীজদের স্বভাবের ভেতরে ছিল সহজাত হিংস্রতা। ওদের রক্তের ভেতরে ছিল হত্যার অনুপ্রেরণা।

তাই লিসবন থেকে পর্তুগালের রাজারা যে ফরমান দিত—যেগুলো কোনটাই খারাপ নয় কিন্তু সেই আদেশ কার্যকারী করতে যারা আসতো তারা কিন্তু সাগর পাড়ি দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে সব ভুলে যেত—

দিনের পর দিন যেদিকে তাকাও শুধু জল আর জল—কোথায় কতদূরে স্ত্রী পুত্র স্বজন পরিজন—আর কোনদিন তাদের কাছে যেতে পারবে কিনা সেই হতাশা ওদের আরো বেশী হিংস্র করে তুলতো —এই কারণেই ওরা সবচেয়ে আগে এসেও নিজেদের এদেশে এষ্টাব্লিশ করতে পারেনি।

॥ সাত ॥

মার্থা পার্ত্তীমে চলে গেছে। তার ইউনিভার্সিটি খুলেছে। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে আলবুকেরুখির। বইটা নিয়ে কত আলোচনা করতো, কত ক্রটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দিত! পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে অসহায় চোখে তাকালো। কি করে যে এত বড় ব্রড ক্যানভাসের লেখা শেষ করবে! নিদারুণ একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধতে লাগল মনে। শূন্য ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারী করল।

স্লেভট্রেডের ওপরে বই লেখার মূল প্রেরণা, সেই খাতাটা খুলল। পেড্রোর স্ত্রী লরার সেই ডায়েরী! অনেক—অনেকবার—এই দীর্ঘ তেইশ বছরে না হলেও হাজার বার এই ডায়েরী পড়েছে। কখনো পেন্সিলে, কখনো জলো কালিতে লেখা। তার কোন জায়গায় জল পড়েছে, কোন জায়গা একটু ছেঁড়া ছেঁড়া। বহুকষ্টে পাঠোদ্ধার করেছে। ডায়েরীর কোন কোন অংশ এত অসংলগ্ন যে অর্থই বুঝতে পারা যায় না। তবুও এর ভেতরে আছে প্রায় তিনশো বছরের দাস ব্যবসার ইতিবৃত্ত—খাতার প্রথমেই লরার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিটা আলবুকেরুখির মনের ভেতরে আনাগোনা করতে লাগল—

'আমার কপাল—দুঃখ কষ্টের কপাল, আমার মা অত্যাচার সহ্য করেছে, আমার দিদিমা করেছে, দিদিমার মা করেছে,—আমার মায়ের দিকের বংশটা যে স্লেভের বংশ।' লরা তার মা দিদিমার মুখে যেমন শুনেছিল তেমনি লিখেছিল সেই ডায়েরী। বহুবার পড়ে সে যতটুকু বুঝেছে আর স্লেভট্রেডের ওপর পড়াশুনা করে সন তারিখ মিলিয়ে লিখতে শুরু করল তিন দুর্ভাগিনী দাসীর বিচিত্র ইতিহাস।

লরার মা বেঁচো[illegible]ন নব্বই বছর। দিদিমাও দীর্ঘায়ু ছিলেন। একশো বছরের বেশী বে[illegible]লেন। আর তার মা অর্থাৎ প্রমাতামহীও দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল। [illegible]তানই ডানভার সাহেবের লেখা 'পর্তুগীজ ইন ইণ্ডিয়া'তে রাণীর মহিমায় বিরাজ করছেন—

১৬২০ খৃষ্টাব্দের এক বর্ষার রাত্রে সুন্দরবনের উপকণ্ঠে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সে সময় চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন থাল—রায়মঙ্গল, হাতিয়া ইত্যাদি পর্তুগীজ জলদস্যু অধ্যুষিত ছিল। তারা গঙ্গা পাড়ি দিয়ে এসে শত শত ছিপ

নৌকো নিয়ে ঢুকে পড়তো খালে। খালের দুই দিকে সুন্দরবনের সুন্দরী, গরান-জগ্‌গড়মুর গাছের জঙ্গল। ডালাপালাগুলো হুমড়ী খেয়ে পড়েছে খালের জলে।

কাঠুরে আর মধু সংগ্রহকারীরা ছাড়া আর কেউ সেসব জঙ্গলে আসতো না। ডালে ডালে বড় বড় সাপ ঝুলছে। কোথাও কিলবিল করছে জোঁক। আর বনের শুকনো পাতার ওপর হিংস্র জন্তুদের চলাফেরার খড়মড় আওয়াজও পাওয়া যেত। এই রকম একটা খালে প্রায় একশো ছিপ নৌকার একটা বহর লুকিয়েছিল। এদের পরিচালনা করছিল জোসে ফেরিয়া পার্টান নামে পর্তুগীজ বোম্বেটে।

যেই রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে নামল অমনি পার্টান তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে এগিয়ে চলল লোকালয়ের দিকে। তাদের হাতে দাউ দাউ করে জলছে মশাল। ঘাড়ে ঝুলছে ঝকঝকে বন্দুক। বন্দুকের নলে আগুনের শিখার ছায়া কাঁপছে থর থর করে।

ওরা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের প্রান্তে এসে থামল।

গ্রামের নাম কীর্তনখালি।

সে আমলে কীর্তনখালী বড়লোকের গ্রাম বলে খুব নামডাক ছিল। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ধানের গোলা। অধিকাংশ বাড়ীর চালে টিন। গোয়ালে গোরু।

পার্টান গ্রামের চারিদিকে চারজন সৈন্য রেখে দিয়ে বাদবাকী অনুচরদের নিয়ে ভেতরে গেল। ঘরে ঘরে খিল বন্ধ। অধিবাসীরা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

হিংস্র রক্তখেকো বোম্বেটেদের হাতের মশালের আলো প্রেতচ্ছায়ার মত কাঁপছে চারিদিকের গাছগাছালিতে। যেন কিসের তীব্র তৃষ্ণায় তারা অস্থির হয়ে উঠেছে।

অস্থির হয়ে উঠেছে পর্তুগীজ দস্যুরাও।

তাদের হাতগুলো নিসপিস করছে। ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে, কেন—কেন—মেজর পার্টান এখনও কিছু বলছে না। এখনও বাড়িতে আগুন দিতে বলছে না—লুঠতরাজ করতে—

পার্টান স্থির।

মাথা নীচু করে নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে এক মনে কি ভেবে চলেছে।

স্যার—একটা যা হোক কিছু অর্ডার দিন—

তবুও কিছু বলল না পার্টান। ডাকাতি করতে এসে কে জানে কোন গুরুভার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মন!

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে স্যার—এরপর এখান থেকে চলে যেতে হবে—

চুপ রও—উল্লুক—ডাকাতি করার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে গিয়েছো—শয়তান কোথাকার—বিড়বিড় করে বলল, আমি লুঠতরাজ করতে আসিনি।

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল অনুচররা।

তাহলে সেই বিকেল হতে না হতে ছিপ নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ার কি দরকার ছিল, কি দরকার ছিল এই সশস্ত্র নৈশ অভিযানের?

শোন, তোরা একটু দাঁড়া, আমি না আসা পর্যন্ত চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি। বলেই অন্ধকারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল পার্টান।

ঘন অন্ধকারে চুপ করে ওরা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রইল। উদ্বেগে উত্তেজনায় জলদস্যুরা ঘামতে লাগল।

পার্টান একটা শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়াল। উঠোনের ওপর একটা জাম গাছ। এই ঝাপড়া জামগাছের নীচের জমাট অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো পার্টান।

তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল তন্বী সুন্দরী এক নেটিভ মেয়ের ছবি। তার চোখেমুখে মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত আশ্চর্য কমনীয়তা। ফরসা গায়ের রঙ। পেঁচিয়ে পরেছে ঘন নীল ডুরে শাড়ি। নীলরঙের ভেতরে যেন একটা উগ্র বিদ্যুৎ রেখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এত রূপ একটা নেটিভ মেয়ের হয়!

রায়মঙ্গল খাল থেকে কলসী ভরে জল নিয়ে সে বাড়ী ফিরছিল। ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছিল পিঠের নীচ পর্যন্ত। শেষ সূর্যের রক্তাভ আলো তখন খালের জলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! গাছের নীচে নীচে অন্ধকার জমছে ঘন হয়ে। ঘনায়মান সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে বিদ্যুতলতার মত সেই উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ে তাকে অস্থির করে তুলেছিল। খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিল তার পরিচয়। কখনো গ্রামের লোকের মারফৎ, কখনো সাহেবী আভিজাত্য জলাঞ্জলি দিয়ে নিজে তার অভিপ্রায় জানিয়েছিল।

কিন্তু না—কিছুই হয় নি। বড় শক্ত ঠাঁই। সতীদাহের দেশের মেয়ে মরে যাবে। তবু ধর্ম বিসর্জন দেবে না। এই তো দুইদিন আগেই এইখানে

এই শিবমন্দিরের চত্বরে নিরালায় তার সঙ্গে দেখা করেছিল। মন্দিরে পূজো দিয়ে ফিরছিল। হাতে নৈবেদ্যর থালা, পরনে গরদের শাড়ি। মুখে পূজারিনীর মত একটা সুদূর গম্ভীর পবিত্রতা। হঠাৎ দেখলে কামনা জাগে না। রক্তের ভেতরে লালসার আগুন জ্বলে না। শুধু অভিভূত একটা আচ্ছন্নতায় চেতনা কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। দেবীর কাছে ভক্ত যেমন আকুল হয়ে প্রার্থনা করে তেমনি করে বলেছিল, আমরা বোম্বেটে, আমরা ফিরিঙ্গী জলদস্যু, আমরা নেটিভ মেয়েদের দূরদেশের স্লেভমার্কেটে বিক্রি করি তবুও কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমি সম্মান দেব—আমার ঘরনী—

চুপ করো সাহেব আর কখনো একথা মুখেও এন না, একটু থেমে বলেছিল, আমার দাদু শুনলে অনর্থ বাধাবে—বলেই চলে গিয়েছিল। বিদেশী হলেও সে নেটিভ মেয়েটির কথায় চাপা প্রশ্রয়ের আভাস পেয়েছিল। তখুনি মনে হয় ওর বুড়ো হাবড়া দাদুটাকে মেরে ওকে লুঠ করে নিয়ে যায়—

না লুঠতরাজ নয়। রাহাজানি নয়। জোর জবরদস্তি নয়। আর একবার—আর একবার বলবে।

টক্—টক্—টক্—কড়া নাড়ল। প্রথমে একটু আস্তে—তারপর জোরে—খক—খক—খক—শুকনো কাশির শব্দ হলো ঘরের ভেতর থেকে।

টক্ টক্ টক্—আবার কড়া নাড়ল—

খট্—দরজা খোলার শব্দ হলো। বেরিয়ে এল অশীতিবর্ষের এক বৃদ্ধ। হাতে লাঠি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ গলায় বলল, কে বাবা—এত রাত্রে এসেছো—

আমি এসেছিলাম—সসঙ্কোচে এসে দাঁড়াল জেনারেল পার্টান।

না—না—তুমি যাও—যাও সাহেব—তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি—তুমি যা বলছো তা আমার জীবন থাকতে সম্ভব হবে না—তুমি যাও—আমাদের বিপদ বাড়িও না—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

তরল অন্ধকারে বৃদ্ধের পিছনে একটি ছায়াদেহের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছুটে সামনে এল সে। অন্ধকারে মনে হল, যেন একটা বিদ্যুতের রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সেই তন্বী অষ্টাদশী। কপট গম্ভীর ও কঠোর স্বরে বলল দীনু আচার্যের নাতনী, দেখো পার্টান, তোমাকে তো আমি বহুবার বলেছি, তুমি যা চাচ্ছো তা হয় না—হতে পারে না—

কেন হবে না চিত্রা? তোমাকে তোমার দাদু বিয়ে দেবে একটা ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে?

হ্যাঁ দেবে। দেবে এই বুড়োর সঙ্গেই। শুধু বুড়ো নয় তার আরও সাতটা বৌ আছে, তাদের এক কাঁড়ি ছেলে মেয়ে আছে। তবুও—তবুও সেই ঘাটের মড়াকেই বিয়ে করতে হবে, বলতে বলতে চিত্রার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কান্নায় ভার ভার অস্পষ্ট গলায় বলল, সে যে কুলীন—আমি কুলীনের মেয়ে—

ব্রুট—তুমি এই অন্যায় মেনে নেবে?

নিতেই হবে, তা না হলে দাদুকে এক ঘরে হয়ে থাকতে হবে।

সাগরপারের সাহেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত! তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, এদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের শ্মশানে সতীদাহের মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য! চিত্রার মত কত কচি মেয়েকে এই দীনু আচার্যের মত হিঁদেনগুলো পিঠ মোড়া করে বেঁধে নিয়ে জলন্ত চিতায় তুলছে।

ওরে বাবা রে ডাকাত পড়েছে—বাঁচাও—বাঁচাও—

কীর্তনখালী গ্রামের প্রান্ত থেকে হঠাৎ গ্রামবাসীদের আর্তচিৎকার ভেসে এল। ঘেসাঘেসি বাড়ীর খড়ের চালে চালে লেলিহান আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জলে উঠল। শিশুদের কান্নায়, মেয়েদের আর্তনাদে, বৃদ্ধদের বুক ফাটা চিৎকারে মুহূর্তেই যেন সেই ভোরের নিযুপ্ত নিস্তব্ধ গ্রামে মহাপ্রলয় নেমে এল।

ওরা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। পারেনি পার্টানের জন্য প্রতীক্ষা করতে। ওরা জলদস্যু। তাদের রক্তে রক্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে শুধু ধ্বংসের হিংস্র উন্মাদনা!

পার্টানের কাছে মুহূর্তে সব ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রত্যাখ্যানের অপমানে তার মনের ভেতরে তখন অমনি আগুন জলছে। কানদুটো তেতে লাল হয়ে উঠেছে। সে ছুটে গেল জলন্ত বাড়ীগুলোর দিকে। কিন্তু অনুচরদের বাধা দিল না। তারা বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকে লুটতরাজ করতে লাগল। যুবতী মেয়েগুলোকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। চারিদিকে আগুন, আর্তনাদ, বুকফাটা কান্না, আর কামার্ত পশুদের পৈশাচিক উল্লাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে জলদস্যুদের অধিনায়ক পার্টানের মনে হলো—মনে হলো এই সব মৃত্যুজীর্ণ গ্রামের অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোকে এমনি করেই টিপে টিপে মারা উচিত—উচিত পৃথিবীর মাটি থেকে একেবারে

নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। ভাবতে ভাবতে তার স্নায়ুর ভেতরে তীব্র উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। চিত্রার ঢলঢলে ডাগর মুখখানা, কুলীনের মেয়ে বলে তার ভবিষ্যৎ করুন পরিণতি তাকে চঞ্চল করে তুলল। সে অনেকদিন বাংলা মুলুকে আছে। দেখেছে, একটা কুলীনের ছেলে সারাজীবন বারো তেরটা মেয়েকে বিয়ে করে। তাদের কারো কাছে একবার কি দুবার আসে, আবার কারো কাছে একবারও আসে না। মেয়েগুলো যৌবনের জ্বালায় নষ্ট হয়ে যায়। অবৈধ মেলামেশার ফলে গর্ভসঞ্চার হলে বাবা মা কিছু এঁঠো কলাপাতা আর কিছু সুখাদ্যের উচ্ছিষ্ট ফেলে দেয় বাইরে আস্তাকুঁড়ে। আর পড়শীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, জামাই এল আর হুট করে চলে গেল সেই রাত্রেই গো—সে কাজের লোক—তার পক্ষে কি পরিবারের কাছে বসে থাকা সম্ভব ···আর যদি কোন কারণে কলঙ্ক চাপতে না পারে তাহলে হতভাগীকে মাথার চুল কেটে ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়।

চিত্রা—চিত্রার ওই ঘন কালো মেঘের মত চুল ও দীঘল শরীরে দুর্ণিবার যৌবন—না—না—অসম্ভব—অসম্ভব বদ্ধ একটা উন্মাদের মত ছুটল আবার দীনু আচার্যের বাড়ীর দিকে। তখন পার্টার্ণ এক ভিন্ন মানুষ! দুচোখে উগ্র আক্রোশ ধূ ধূ করে জ্বলছে। বুকের রক্তে আগুন ধরে গেছে।

কোন কথা না বলে দীনু আচার্যকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে চিত্রাকে নিয়ে এসে তুলল তার ছিপ নৌকোয়। তাকে নিয়ে এল রায়মঙ্গলের কাছে তাদের একটি ডেরায়। কিন্তু—

চিত্রাকে নিয়ে পার্টান সাহেব বেশ মুস্কিলে পড়ল। এর আগে এইসব গ্রামের শত শত মেয়েকে তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদের স্লেভের ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তার অনুচররা তাদের খুশিমত উপভোগ করেছে। কিন্তু চিত্রা—চিত্রার সঙ্গে সেরকম কোন অশোভন ব্যবহার সে কল্পনাও করতে পারল না। তার তীব্র আগুনের মত রূপ। তার কালো দুটো ডাগর চোখ। সেই চোখ জ্বালাকরা রূপের সামনে দাঁড়িয়ে তার ভেতরের উদ্দামতা কেমন স্তিমিত হয়ে আসত। ভোগের বিন্দুমাত্র বাসনাও মনে আসতো না—শুধু পরম প্রার্থিত বস্তুর মত তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করতো।

কিন্তু বোম্বেটেদের অন্তরে যাই থাক, কোন ধরে আনা ভিনদেশী মেয়েকে

স্ত্রী কি প্রণয়ীনির সম্মান দিয়ে দলে রাখার কোন রেওয়াজ ছিল না। আবার অতুলনীয় সেই রূপসী মেয়েকে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখাও কঠিন।

তাহলে কি শেষ পর্যন্ত 'স্লেভ'দের সঙ্গে চালান দিয়ে দিতে হবে! এত কষ্ট করে তাকে এনেছে। চিত্রাকে কথা দিয়েছে, তাকে সম্মান দেবে—ঘরণী করবে—কিন্তু নেটিভ মেয়েকে বিয়ে করলে যে লিসবন থেকে তার বরখাস্তের ফরমান চলে আসবে। নোটিভ মেয়েকে তার কাছে রাখতে গেলেই তাকে স্লেভ করে রাখতে হবে। বাইরে তার একটি পরিচয় 'স্লেভ'—কিন্তু ভেতরে সে উপপত্নী হতে পারে, হতে পারে শয্যাসঙ্গিণী আরো অনেক কিছু—কিন্তু চিত্রা কি এই ভাবে থাকতে রাজী হবে—সে যে বড় আশা করে এসেছে।

তাদের দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর তার রাগ হলো—একটা দেশকে শুধু শোষণ করবে—রক্ত চুষে খাবে—কিন্তু সেই দেশের মানুষের প্রতি এতটুকু মনুষ্যত্ববোধ থাকবে না। প্রীতি থাকবে না। শুধু একটানা শোষণ আর অত্যাচার দীর্ঘদিন চলতে পারে না—এভাবে চললে এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে—বহুবার এসব কথা সে গোয়ায় তাদের গভর্ণরকে জানিয়েছে—কিন্তু কোন ফল হয় নি—। তিনি বলেন—লিসবনের (পর্তুগালের রাজার) এই নির্দেশ—আমি কি করবো—সে যাহোক—চিত্রাকে নিয়ে কি করা যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল চট্টগ্রামের কথা—সেসময় পূর্বাঞ্চলে তাদের ডেরা ছিল চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম বন্দর হিসেবে খুব আকর্ষণীয় স্থান।

অর্থাৎ চট্টগ্রামে পর্তুগীজ জলদস্যু এবং আক্রমকারী ও ভ্রমণকারীদের কাছে খুব আদর্শ বন্দর ছিল। কেননা মেঘনা নদী হয়ে বাঙ্গলার বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর সোনারগাঁওতে যেতে হলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধাজনক ও সহজ পথ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভ্রমণকারী ইবন বতুতা এবং চীনা পরিব্রাজক ফা—হুয়েন এই পথ দিয়েই বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন।

পর্তুগীজ গভর্ণর জ হেনরিই ডি মেঞ্জেস একটি কুঠি নির্মাণ করেছিলেন চট্টগ্রাম। তিনিই সোনারগাঁওয়ের কাছে ডায়মণ্ডহারবারে আর একটি ছোট কুঠিও তৈরী করেছিলেন। এই কুঠিরই সর্বাধিনায়ক ছিল জোদে ফেরিয়া পার্টান।

পার্টান একবার ভাবল চিত্রাকে চট্টগ্রামের কুঠিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু

আবার মনে হল, সেখানে কোন নেটিভ মেয়েকে রাখতে হলেও তো গোয়া থেকে গভর্ণরের অনুমতি আনতে হবে। তাই—চিত্রাকে ডায়মণ্ডহারবার কুঠিতেই রাখল কিন্তু তাদের নিয়ম ছিল—নেটিভ মেয়েকে সাত দিনের বেশী কোন কুঠিতেই রাখা হবে না।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে যাবে। খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল পার্টান। বাইরে ব্যবসার কাজে বেরিয়ে যায়। কিন্তু মন পড়ে থাকে তার কুঠির খাসকামরায়। ওদিকে একক নিঃসঙ্গ চিত্রা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলে। এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। নিজের জীবনের এই চরম বিপর্যয়ের ভেতরেও একটু আশার আলো দেখতে পায়।

পার্টান শুধু সেই লুঠতরাজের রাত্রি ছাড়াও তার আগে বহুবার তার সঙ্গে দেখা করেছে! ভাষা জানে না। কিন্তু বুকের ভেতরে লুকানো ভালবাসার অনুভূতি মেয়েদের বুঝতে কখনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু—

কৈ পার্টান তো তাকে—না, প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত তার কাছে আসে। বসে। হেসে সস্নেহে মিষ্টি করে বলে—তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত চিত্রা?

চিত্রা কোন কথা বলে না। শুধু বুকের ভেতরে একটা তীব্র অস্বস্তি কাঁটার মত বেঁধে। ও পল্লীবাংলার মেয়ে। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

কিন্তু পার্টানের বুঝতে বাকী থাকে না কিছুই। লজ্জার ছায়া পড়ে বোম্বেটেদের সর্দারের শক্ত লাল পাথরের মত মুখে। সসঙ্কোচে বলে, চিত্রা আর একটু অপেক্ষা কর আমি গোয়ায় স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার পাঠিয়েছি আমাদের গভর্নর মেজ্ঞেসের কাছে—

কেন?

বিয়ের পারমিশান চেয়ে পাঠিয়েছি।

যদি না আসে অনুমতি—

তাহলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব, জাত ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবো, তোমাকে নিয়ে এই বাংলাদেশেরই কোন গ্রামে সংসার করবো, বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল পার্টান।

আর কোন কথা বলেনি চিত্রা। শুধু পরম নিশ্চিন্তে পার্টানের চওড়া বুকে মাথা রাখে।

কিন্তু সাগরের এপার ওপারের দুটো নরনারীর সুখস্বপ্ন ভেঙে যেতে একটুও দেরী হলো না।

জোয়াডো—ডি—সিলভেরিয়া দুর্ধর্ষ জলদস্যু। মালদ্বীপের কুঠির ইনচার্জ। তার অত্যাচারে মালদ্বীপের মানুষ একটি রাত্রেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতো না। গুজরাট এবং বঙ্গদেশের যত সওদাগরী জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরদেশে যেত তাদের ঘেরাও করে সর্বস্ব লুঠ করতো। দিনে দিনে বেড়ে গিয়েছিল তার অত্যাচার। অবস্থা বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল।

জাহাঙ্গীর তখন দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করছেন। তিনি সিলভেরিয়াকে দমন করার জন্যে বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খাঁকে হুকুম করলেন। সিলভেরিয়ার কানে পড়ল সাতশো রণতরী নিয়ে সম্রাটের প্রতিনিধি খাঁ সাহেব আসছে। সে তাড়াতাড়ি সাহায্যের আশায় ছুটল মোগলের শত্রু যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে। জানাতে এল তাড়াতাড়ি ডায়মণ্ডহারবার কুঠির পার্টানকে।

সিলভেরিয়া এসে দেখল, ব্যবসা এবং দস্যুবৃত্তি পরিচালনার জন্যে পর্তুগীজরা যেমন কুঠি গড়তো—এ কুঠি—সেই কুঠি নয়। রীতিমত কুঞ্জবন। সবুজ প্রাঙ্গণে পোষা ময়ূর খুঁটে খুঁটে কি খেয়ে বেড়াচ্ছে—ওখানে হরিণ সবুজ পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। 'আর তপোবনের মত শান্ত প্রাঙ্গণের সেই পরিবেশে বন হরিণীর মতই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এক তন্বী উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। প্রতিমার মত সুন্দর সুডৌল মুখ।

আগুন জ্বলে উঠল—আগুন জ্বলে উঠল সিলভেরিয়ার মাথার ভেতরে। মনের ভেতরে উদ্বেল হয়ে উঠল একটি বাসনা—যেমন করে হোক্ সর্বস্ব এমন কি প্রাণের বিনিময়েও এই নারীকে তার চাই—চাই—

পার্টানের সঙ্গে দেখা হলো, হলো কাজের কথা। তারপরেই বলল, এই বিউটিফুল নেটিভ মেয়েটি কে ?

কোন কথা বলল না পার্টান। কোন মিথ্যা কথাও তার মুখে জোগালো না।

কী চুপ করে আছো যে পার্টান ?

যেই হোক—তোমার সে খোঁজে দরকার কি ? কঠোর গলায় বলল, তুমি যে কাজে এসেছো, তাই নিয়ে মাথা ঘামাও—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না সিলভেরিয়ার। বলল, তোমার কঙ্কুবাইন না কি ? বাবা—বাহবা—বেশ তোফা আছ ভাই—হো হো করে হেসে উঠল সিলভেরিয়ার। হায়েনার মত শুকনো খটখটে হাসি।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে নীরবে সহ্য করল পার্টান।

চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে সিলভেরিয়ার বলল, তুমি কোন নেটিভ মেয়েকে কুঠিতে রাখতে পারো না পার্টান—হয় তোমাকে স্লেভ ডিলারদের কাছে বিক্রি করতে হবে—না হয়—

না হয় কি?

হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল অত্যন্ত লজ্জাকর নোংরা একটা কথা। লোভের আভায় দগদগে ঘায়ের মত জ্বলতে লাগল তার চোখ দুটো।

ব্রুট।

ঘটনাটা ঘটে গেল সেইদিন রাত্রেই।

নিশি রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে চারদিকে। কৃষ্ণা রাত্রির স্রোত তরঙ্গায়িত হয়ে বয়ে চলেছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। তরল অন্ধকারের পটভূমিতে একটি নিকষ কালো ছায়ামূর্তি ধীর পায়ে উঠে এল চিত্রার ঘরের বারান্দায়।

না। দরজায় ঘা দিল না। উঁকি দিল জানালায়। ভেবেছিল, পার্টানকে দেখবে নিশ্চয়ই মেয়েটির কণ্ঠলগ্না হয়ে পরম আরামে ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু—

কোথাও পার্টান নেই। শুধু জ্যোৎস্নার একটা রেখার মত গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে সেই অপরূপ তন্বী দেহ। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে অল্প অল্প ওঠা নামা করছে তার সুডৌল বুক। সেই মুহূর্তেই সিলভেরিয়ারের ভেতরে নারীমাংসলোলুপ সেই দৈত্যটা জেগে উঠল। আর গরাদহীন সেই খোলা জানালা দিয়েই ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। মুহূর্তে কবুতরের মত সেই নরম দেহ তুলে নিল তার বুকের ভেতরে। ভয়ঙ্কর আর তীব্র একটা নিষ্পেষণের ভেতরে আচমকা আর্তনাদ করে জেগে উঠল দুর্ভাগিনী চিত্রা—

ওদিকে পার্টান নিজে ছুটে এসেছিল চিত্রার ঘরে। তারপরে যা হয় তাই হয়েছিল। এক নারীকে কেন্দ্র করে দুই পুরুষের তীব্র লড়াই। বিবদমান দুই শত্রুর তলোয়ারের ঝন ঝন শব্দে, আর হিংস্র বিক্ষুব্ধ হুঙ্কারে, ভয়ে উত্তেজনায় আর্তনাদ করে উঠেছিল চিত্রা।

বহু কষ্টে চিত্রাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেই রাত্রেই পার্টান গোয়ায় রওনা হয়েছিল। সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল সিলভেরিয়ার। শেষ পর্যন্ত গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তাকে ফিরতে হয়েছিল।

আমাকে তুমি—তুমি সমুদ্রের জলে ফেলে দাও—কাঁদতে কাঁদতে আকুল হয়ে পার্টানের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল চিত্রা।

চলো তো, আমাদের গভর্ণর মেঞ্জেস বড় ভাল লোক—

এল গোয়ায়। মেঞ্জেসকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল পার্টান। পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে বলল, আপনি—আপনি প্লিজ ওকে বিয়ে করার স্পেশাল পারমিশান দিন স্যার—

নো—ইম্পসিবল! মাথা ঝাঁকালো মেঞ্জেস।

তুমি ওকে স্লেভ কঙ্কুবাইন করে রাখো না হে—যেমন করে সবাই—অত কি—

ওকে স্লেভ করতে পারবো না স্যার। দেখেছেন ওর চোখমুখ—কি সেক্রেড আর ডিভাইন বিউটি—

কিছু বলল না মেঞ্জেস। বুঝতে পারল পার্টান ওকে ভালবেসেছে।

রাত্রে চিত্রা বলল, শেষ পর্যন্ত আমাকে চালান করে দেবে স্লেভদের সঙ্গে; তোমার বড় সাহেব তো তাই বলল মনে হল—

না—না—আমার প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না চিত্রা—

হতাশার ছায়া নামল পার্টানের চোখে।

কিন্তু পার্টানের হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তার ছায়া নামল মেঞ্জেসের চোখে। কিন্তু কিছু বলল না।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না মেঞ্জেসের চোখে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল প্রিজন ব্যারাক অর্থাৎ বন্দীশালার দিকে। তার লোকেরা দস্যুবৃত্তি করে গুজরাটের কাথিওবাড়ের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসেছে শত শত তরুণী মেয়ে। মেয়েরা কেউ গুমরে কাঁদছে, কেউ সব দুশ্চিন্তার ভার বিধাতার ওপর ছেড়ে দিয়ে পরম আরামে ঘুমোচ্ছে!

—ওদের ক্রিশ্চান করে আমাদের বিয়ে করতে দিন স্যার, আমাদের বংশধর বাড়বে—

—এদেশে উপনিবেশ গড়ে তুলতে হলে নেটিভ ব্লাডের সঙ্গে ইণ্টারকোর্স হওয়া দরকার স্যার—বিবাহেচ্ছু তার অনুচরদের উক্তিগুলো তার কানে বাজতে লাগল। কি করা যায়—তার স্বদেশের স্বার্থে এবং অনাগত ভবিষ্যতে এক সুখী সম্পন্ন উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিজের দায়িত্বে ওদের বিয়ের অনুমতি দেওয়া দরকার। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো।

ঘন অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি চলেছে প্রাসাদের ভেতরে বুড়ো শিরীষ গাছের দিকে। হাতে দড়ির মত ওটা কি। সর্বনাশ নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতে চলেছে। চীৎকার করে ডেকে উঠল মেঞ্জেস—কে—কে—ওখানে—

ছায়াদেহের গতি আরও দ্রুত হয়ে উঠল।

মেঞ্জেসও ছুটলো।

কি ব্যাপার! বন্দীনিবাসের কোন মেয়ে না কি? কুঠির ভেতরে আত্মহত্যা করলে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। জোর ছুটে তাকে ধরে ফেলল—

সর্বনাশ! তুমি!

পাটার্ন যাকে নিয়ে এসেছে—কীর্তনখোলির দীনু আচার্যের মেয়ে! সে কান্নায় ভার ভার গলায় বলল, তোমাদের এখানে দাসী হয়ে থাকতে হলে আমি—অবরুদ্ধ ব্যাথায় বাদবাকী কথাগুলো আর বলতে পারল না—

তুমি ঘরে এস—তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমাকে 'স্লেভ' হয়ে থাকতে হবে না—

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত! মেঞ্জেস সেই রাত্রেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল। সেই সিদ্ধান্ত ডানভারের পর্তুগীজ ইন ইণ্ডিয়ার পাতায় সোনার লেখার মত জ্বল জ্বল করছে—Dom-Henrique de Menzes made an arrangement of marriage of the Portuguese with the captive native ladies. First he converted them to Christianity and married them to his our men. No less than 450 of his men were thus married in Goa. Not only that, he alloted them lands, and cattles, so as to give them a start in life.

অর্থাৎ তাদের ধর্মান্তরিত করিয়ে চার্চে নিয়ে যেয়ে ভুমদাম বিয়ে দিয়ে দিল মেঞ্জেস। জমি জিরাত বাড়ীঘর দিয়ে একেবারে পুরো সংসারী বানিয়ে দিল!

ওরা ডায়মণ্ডহারবার কুঠিতে ফিরে এল।

ওরা—চিত্রা পার্টান আর জোসে ফেরিয়া পার্টান!

জোসে পার্টানের মৃত্যুর পর কুঠির সর্বময়কর্ত্রী হয়ে উঠেছিল চিত্রা পার্টান। ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা, সুবেদারের সঙ্গে দেখা করে বাণিজ্যিক সুখসুবিধা আদায়ের চেষ্টা—কুঠির যাবতীয় কাজে বিচিত্র পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। ইতিহাসে আছে One native girl, widow, of

Juse Ferrier Partan became in charge, of Portuguese Khuti of Diamond Herbour.

এই হলো লরার প্রমাতামহীর বৃত্তান্ত—আর তার মেয়ে ডোরা পার্টানের কাহিনী আরও বিচিত্র—

॥ আট ॥

চিত্রা পার্টানের মেয়ে ডোরা পার্টান।

জোসে পার্টান মারা যাওয়ার পরে গোয়া থেকে আর কোনও ইনচার্জ পাঠায় নি গভর্নর। কেন না চিত্রা খুব দক্ষতার সঙ্গে কুঠির কাজ পরিচালনা করছিল। তাই কুঠির সর্বময়ী কর্ত্রী তার মার স্নেহচ্ছায়ায় রাজকুমারীর মত অত্যন্ত আদরে বড় হয়ে উঠছিল ডোরা। কিন্তু—

চিত্রা ভাবে মেয়ে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে। কুঠির সেকেণ্ড অফিসার ব্যাবলোর সঙ্গে খুব মাখামাখি করছে। নিষেধ করলেও শোনে না অবশ্য শোনার বয়সও নয়। কিন্তু তাই বলে রোডি গো—ডি ব্যাবলো। লিসবনের কোন অনাথ আশ্রমে বড় হওয়া জারজ ছেলেটা হবে তার জামাই? কিছুতেই না—

ঘন ঘন চিঠি লেখে গভর্নর ফ্র্যান্সিসকো—জোসে ডি—সামায়ো ক্যাস্ট্রোকে। ম্যাঞ্জেসের পর তিনিই এখন ইণ্ডিয়ার গভর্নর। লেখে আমার বয়স হয়েছে—এখানকার দায়দায়িত্ব আর বহন করতে পারছিনা—স্মার্ট কোন ইয়ংম্যানকে বাংলা মুলুকের এই কুঠির দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিন'—ইংরেজরা কুঠি আক্রমণ করবে বলে মাঝে মাঝে হুমকী দেখাচ্ছে', যখন তখন আমাদের স্লেভের কনসাইনমেন্টের জাহাজ আটকে দিচ্ছে···ইত্যাদি দুঃখদুর্যোগের আরও অনেক—অনেক খবর।

কিন্তু যা লিখুক—বহুদর্শী চিত্রার মনের ভেতরে বাসা বেঁধে আছে ধূর্ত অভিসন্ধি—গোয়া থেকে নতুন সাহেব এলে ডোরাকে তার সঙ্গে জুটিয়ে দেবে—তার মেয়ে দেখতে ফ্যালনা নয়। বাপের মত গায়ের রঙ তো পেয়েছে। আর তার মত মুখশ্রী। যে দেখে তারই মন টানে। বলাবাহুল্য, এখানকার ভাবী ইনচার্জেরও মন টলবে। সে তো আর দেবতা

নয়! একবার মনে ধরলেই হলো—ডোরাও তার মত সসম্মানে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে—

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। গোয়া থেকে ক্যাস্ট্রো লিখল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। ইংরেজরা বোম্বাই দখল করেছে। দিনের পর দিন তাদের ঔদ্ধত্য বেড়েই চলেছে। আমরা ভাবছি, সুদূর বাংলামুলুকে আর বোধ হয় আমাদের কুঠি রাখা সম্ভব হবে না—ওখানে শুধু আপনি একজন নেটিভ মহিলা ইনচার্জ হয়ে আছেন বলেই বোধ হয় ওরা তেমন কিছু করছে না—

চিত্রা ভাবে আচ্ছা মজা তো—মাত্র সাতশো সৈন্য আর ওই হাড় জিরজিরে চেহারার ছোকরা র‍্যাবোলোর ভরসায় একা একটা মেয়েমানুষ ওই ডাগর বয়সের মেয়েকে নিয়ে আর কতদিন---কতদিন এই বিপদের মুখে থাকবে? আবার খুব কড়া করে এসব কথা লিখতেই গোয়া থেকে সরকারী সূত্রে খবর এল—

জেকোমা লোপসে ডি অ্যানড্রেড আসছে!

খাস লিসবনের খানদানী ঘরের ছেলে। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। তার সম্বন্ধে আরও কথা লিখে এন. বি. দিয়ে লেখা আছে, খুব খেয়ালী ছেলে কিন্তু—আপনি আপনার মাদারলি প্রেস দিয়ে একটু সামলে সুমলে রাখবেন—

বয়স ত্রিশ। বড় ঘরের ছেলে—চিত্রা পার্টানের মনের অভিসন্ধিটা রামধনুর মত রঙীন হয়ে ওঠে। ডোরাও জানতে পারে সব। দিনের পর দিন র‍্যাবলোর সাহস বেড়েই চলেছে। বেশ বোঝে, ওর মনের [illegible] একটা [illegible] সাপের মত ফুঁসছে। শুধু ওর জন্মবৃত্তান্তের অভিশাপ [illegible] শরীরটার জন্যই সে সাহস পায় না।

তবুও এই তো সেদিন। গঙ্গাসাগর থেকে এক বো[illegible] [illegible] কতগুলো মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। আর একটা লঞ্চে ছিল সে আর র‍্যাবলো।

গঙ্গার বুকে বিকেলের রোদ পড়েছিল বাঁকা হয়ে। হু হু করে ভিজে হাওয়া আসছিল। বন্দীদের বোট থেকে কান্নাকাটি আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। আমাদের ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমরা কি দোষ করেছি—

আমাদের কোথায় চালান দেবে রে?

কে জানে—কলকাতার ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করবে না হয় পশ্চিম মুলুকে চালান দেবে—

ডোরার কানে পড়ে এসব কথা। এই মানুষ বিক্রির ব্যবসাটা তার ভাল লাগে না। তার মা-রও ভাল পছন্দ নয়। কিন্তু কি করবে, গোয়া থেকে তেমন হেলপ আসে না, ওই মানুষ বিক্রির টাকাটা কুঠির মস্ত আয়—

কি ভাবছো ডোরা? ডোরার হাতদুটো জড়িয়ে ধরল ব্যাবোলো। আস্তে হাতদুটো ছাড়িয়ে নিল ডোরা। কিছু বলল না।

আচ্ছা ডোরা তোমার মা কি একা কুঠির কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না?

বয়স তো হয়েছে—

কেন মিসেস পার্টানকে কে সাহায্য করে? সব কাজ কি উনি এক করেন নাকি?

কোন কথা বলল না ডোরা, শুধু গঙ্গার জলরাশির দিকে তাকিয়ে রইল।

দেশী জাহাজ আটকে শুল্ক আদায় করা। গোয়ায় নিয়মিত স্লেভের কনসাইনমেণ্ট পাঠানো, হুগলীর হাটে কিছু স্লেভ বিক্রি করা—এসবই তো আমি করি। হঠাৎ থেমে গেল ব্যাবোলো।

ডোরার চোখের দৃষ্টি দূরে বহু দূরে যেখানে এই গঙ্গা কুয়াশাময় দিগন্ত ছাড়িয়ে সাগরে পড়েছে। সেই সাগরের ঢেউ পাড়ি দিয়ে আসছে তার রাজপুত্র। আসছে লিসবনের খানদানী ঘরের ছেলে। তার মনের ভেতরটা [illegible] হয়। [illegible] ধরেছে ব্যাবোলো।

মা [illegible] মেয়ের ভবিষ্যৎ। আর সেই অনাগত সোনালী ভবিষ্যতের [illegible] মেয়ের চোখেও স্বপ্ন নামে। বড় ঘরের ছেলের ঘরণী হবে। [illegible] তার মত এই বাংলাদেশের মশা ম্যালেরিয়া আর জঙ্গলের ভেতরে [illegible] স্বামীকে নিয়ে চলে যাবে পর্তুগালে—পর্তুগাল—লিসবন সোনার দেশ, স্বপ্নের দেশ, কোথায়—কতদূর কবে—কবে আসবে অ্যাণ্ড্রেড!

দিন কাটে। ডোরা প্রতীক্ষা করে। অ্যাণ্ড্রেড আর আসে না। ব্যাবোলো বাইরে বাইরে ঘোরে। উড়ু উড়ু মন। চিত্রা ডেকে বকাবকি করলে একটু কাজ করে কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার যে-কে সেই। রাগ হয় ছোকরার ওপরে। কিন্তু মেয়ের ওপর থেকে ওর আকর্ষণ গেছে বলে খুশি হয়।

[illegible] আরও মাস অনেক কাটল। কুঠির সৈন্যরা ইচ্ছেমত গ্রামে [illegible]হানা দিয়ে লুঠতরাজ করছে। কখনো চিত্রার অনুমতি নেয়—কখনো নেয় না। কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নবাব হয়ে এসে তাদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছে। প্রায়ই তাদের বাণিজ্য-তরী আটকে ফেলছে নবাবের লোকরা।

কিন্তু যেদিন ব্যাবেলোর ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের ফলে কোচিন থেকে আগত তাদের একটা বাণিজ্যতরী আটক করল মুর্শিদকুলীর অনুচররা! ঠিক সেইদিন—সেইদিনই যেন ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে এসে পৌছল জ্যাকোমো লোপেস ডি এ্যান্ড্রেড।

গঙ্গার পাড়ে একটা উঁচু বেদীর ওপরে দাঁড়িয়েছিল ডোরা। পরণে হলদে রঙের স্কার্ট। গায়ে কালোরঙের মুর্শিদাবাদ সিল্কের জামা। ঠিক মনে হচ্ছিল যেন একটা রঙীন প্রজাপতি। যে কোন মুহূর্তে পাখা মেলে আকাশে উড়ে চলে যেতে পারে—

হু-র-রে—ওই যে সাহেবের জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে—কুঠির-কর্মচারীরা চিৎকার করে উঠল! তাদের ভেতরে ব্যাবেলোকে দেখা গেল না।

বেলা বাড়ে।

ঘাটে জনতার ভীড় বাড়ে! নেটিভরাও কুঠির নতুন সাহেবকে দেখতে আসে। একটু পরেই দূরে জাহাজের ডেকে দেখা গেল এ্যাণ্ড্রেডকে। যেন একটা জলন্ত দীপশিখা। তারুণ্যের তেজে জলজল করছে। হাওয়ায় উড়ছে সোনালী চুল।

ডোরার চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা।

হু-র-র-র-এই—গ্যাংওয়ের ওপরে কার্পেট বিছিয়ে দে রে, হাঁকে ডাকে মুখর হয়ে উঠল ডায়মণ্ডহারবারের জেঠি। ভীড়ের ভেতরে ব্যাবেলোকে কোথাও দেখা গেল না।

চিত্রা পার্টান এগিয়ে গেল, তার চোখমুখ খুশীতে উজ্জল হয়ে উঠেছে। তার বহুদিনের বাসনা যেন মূর্তি ধরে আসছে—

এ্যাণ্ড্রেড নামল।

ডোরার দিকে তাকাল। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্য নেই। কেমন শীতল আর নিরুত্তাপ সে দৃষ্টি। ডোরার বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল।

তোমার কোন কষ্ট হয় নি তো বাবা, অ্যাণ্ড্রেডের ডানহাতটা [illegible]।
চুমু খেল পার্টান।

ও নো—নট অ্যাট অল, থ্যাঙ্কস, বলেই হাত ছাড়িয়ে নিল অ্যাণ্ড্রেড।
কেন যেন খড়্গের মত উঁচু তার লাল টকটকে নাকটা একটু কুঁচকে উঠল।
সেটুকু চিত্রার নজর এড়ালো না। নেটিভ মহিলার স্পর্শ এখনও বরদাস্ত
করতে পারে নি। সব ঠিক হয়ে যাবে—সব ঠিক হয়ে যাবে—ও জানে না এই
বাংলাদেশের মেয়েরা স্বর্ণলতার মত সর্বগ্রাসী। একবার যাকে ভালবাসে তাকে
একেবারে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে দেহমন চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

শুরু হলো ডায়মণ্ডহারবারে পর্তুগীজ কুঠির আর এক অধ্যায়। কয়েকদিন
পরই অ্যাণ্ড্রেড কুঠির সৈন্য এবং কর্মচারীদের বলল, শোন, আমাদের এই
বাংলামুলুকে থাকার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, স্লেভ ট্রেডকে জাঁকিয়ে তোলা—
আরব মার্চেণ্টরা, মুররা চুটিয়ে ব্যবসা করছে—সারা বছরে দশহাজার থেকে
বিশহাজার এদেশী স্লেভ চালান হচ্ছে জাঞ্জিবার থেকে সেণ্ট্রাল আফ্রিকার
কিলউয়া শহরে—

কিন্তু অ্যাণ্ড্রেড—এখানে লুঠপাট করে গাঁয়ের লোক ধরতে গেলে
ইংরেজরা নবাব মুর্শিদকুলির সৈন্যরা—

আপনি চুপ করুণ—আপনার লিনিয়েণ্ট পলিসির জন্য বাংলায় আমাদের
অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে—

চিত্রাপার্টানের মুখ কালো হয়ে গেল।

অনেক—অনেকদিন পরে বুঝতে পারল, কুঠির ইনচার্জ আর সে নয়—
এখন এখানকার দণ্ডমুণ্ডের মালিক হলো জেকোমা লোপসে ডি অ্যাণ্ড্রেড।

কিছুদিন পরে দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসীরা বুঝতে পারল, ডায়মণ্ডহারবারের
পর্তুগীজ কুঠির নতুন সাহেব মানুষ নয়—সাক্ষাৎ খুনে—

রক্তপাত, হত্যা, লুঠতরাজ যেন ওর রক্তের ভেতরে মিশে আছে।
প্রত্যেকদিন রাত্রে কিছু সৈন্য নিয়ে আশপাশের গ্রামে যায়। আর বর্ষার
রাত্রে যেমন—জীওল মাছ ধরে তেমনি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরে নিয়ে আসে
জোয়ান মেয়েপুরুষ! ধরে নিয়ে আসে এক বিচিত্র উপায়ে।

একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে বিঁধে দেওয়া হয়েছে একজনের হাতের তালু—
সেই তীর আবার পাশের লোকের হাতের তালুর ভেতর দিয়ে পার করে
দেওয়া হয়েছে। এইভাবে এক একটা তীরে চারজনের চারটে হাতের চেটো

করে জলে যায়। কিন্তু সে কি করবে! নিরুপায়, দুর্বল মানুষ! শেষ রাতের দিকে যখন ওই পশুটা ডোরাকে নিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে তখন ব্র্যাবোলো দূর থেকে বন্ধ জানালাটার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে!

দিন কাটে। না, ডোরার বুকের ওপর থেকে যেন এক একটা ভারী পাথর নেমে যায়। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কাঁদে। মাথাটা ঘসতে ঘসতে বলে, আর পারি না—আর পারি না—তুমি আমাকে খানিকটা বিষ দাও—

বিয়ের কথা বলেছিলি?

ওসব কথা শোনার সময় কোথায়? তাহলে আমার গা থেকে খুবলে খুবলে মাংস তুলবে কে? একটু থেমে বলে, তুমি বোঝো না, ও কি আর বাবার মত মানুষ—

আর এক নতুন খেয়াল চাপল অ্যাণ্ড্রেডের মাথায়! সে ঠিক করল বন্দী নিবাসের সব তরুণী মেয়েগুলোকে জেল থেকে খালাস করে দেবে! তারপর এই কুঠিবাড়ীর সামনে ওই যে সবুজ এক টুকরো মাঠ আছে—সেখানে চেয়ার পেতে সে বসবে—আর তাকে গার্ড অফ অনার দেবে সুন্দরী নেটিভ যুবতী মেয়েগুলো! গোয়া থেকে এখানে আসার সময় সে'ক্যালে বন্দরে এক মুর রাজাকে দেখেছে।

সমুদ্রের পাড়ে ধু ধু বালুচরে দাঁড়িয়ে আছে রাজা। পরনে রঙীন োষাক। মাথায় ঘন লাল রঙের সিল্কের পাগড়ী। অদূরে সমুদ্রে থেকে ে◌া তুলছে তার অনুচরেরা। মুর রাজা এক মনে তাদের মুক্তো তোলা .দেখছে! আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শত শত তরুণী মেয়ে। দাঁড়িয়ে আছে পটে আঁকা ছবির মত। আর যে দুটো মেয়ে দু'পাশ থেকে রাজার মাথায় বাতাস করছে—তারা দেখতে প্রতিমার মত। যেমন মুখশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্য। কিন্তু ওরা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন—কেন সামনের দিকে একটু হেলে পড়েছে! তার জাহাজের নাবিকদের কাছে পরে সব শুনেছিল! যাক সে কথা! মোটের ওপর সে গার্ড অফ অনারের আয়োজন করছিল।

একদিন চিত্রা নিজেই বলল অ্যাণ্ড্রেডকে। বলল, ডোরার কথা—শ্লেষের হাসি হেসে উত্তর দিল—পার্টান যে ভুল করেছে সে ভুল আমাকে করতে হবে কেন? একটু থামল। আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আর আপনি জোসে ফারিয়া পার্টানের ফিমেল স্লেভ—কেপ্ট ছাড়া আর কিছু নয়—

কি !—কি বললে, তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল চিত্রা।

দস্তুরমত চার্চে গিয়ে গীর্জার হেডবিশপকে দিয়ে বাইবেল পড়িয়ে তাকে বিয়ে করেছিল পার্টান—এসব কথা সে অ্যাণ্ড্রেডকে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু কি হবে—কী লাভ এই পশুটাকে এসব বলে ?

সেদিন থেকে চিত্রা ঠিক করল ডোরাকে নিয়ে গোয়ায় গভর্নর ক্যাষ্ট্রোর কাছে চলে যাবে! বলবে অ্যাণ্ড্রেডের কীর্তিকলাপ।

কিন্তু—

একটা আকস্মিক ঘটনায় ডায়মণ্ডহারবার কুঠির সব কিছু একেবারে ওলট পালট হয়ে গেল।

গোয়া থেকে এল একটা জাহাজ। নামল এক পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন। কিন্তু আশ্চর্য এতবড় সুন্দর সুদৃশ্য জাহাজ—আরোহী কারা ? কোথাও কোন শব্দ নেই! এতবড় একটা খালি জাহাজ এল আরব সমুদ্র থেকে বঙ্গোপসাগরে।

একটু পরেই অ্যাণ্ড্রেড এল। এল আরবী ঘোড়ায় চেপে। হাতে খোলা তলোয়ার। মনে হল যেন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছেন আলেকজান্দার।

স্যার হিয়ার ইজ এ লেটার ফ্রম গভর্নর—ক্যাপ্টেন এগিয়ে এল।

দেখি—চোখদুটো কুঞ্চিত করে চিঠিটা পড়ল।

কোথায় তারা ?

আসুন স্যার—

এতক্ষণ তা জানান নি কেন ?

না জানান নি তার কারণ নেটিভদের মনে খুব 'কমোশান' সৃষ্টি হতে পারে—

হুঁ—বোগাস্—বার্মিজ চুরুটটা নাল তোলা জুতোর নীচে ফেলে পিষে ফেলল।—কি রে বাবা! জাহাজ বোঝাই করে স্লেভদের ডেড বডি এনেছে না কি, কুঠির কর্মচারীরা ফিস ফিস করে। চিত্রার বুক কাঁপে অজানা আশঙ্কায়।

অ্যাণ্ড্রেড আর ক্যাপ্টেন জাহাজের সামনে দাঁড়াল। নামল একদল শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী! কি ব্যাপার! একসঙ্গে এতগুলো খাস বিলেতী মেমসাহেব। একটু পরে সব বৃত্তান্ত জানা গেল—এরা শ্বেতাঙ্গিনী হতে পারে—তবে এরা—অনাথ তরুণী। শুধু অনাথ নয়। জারজ। একেবারে সরাসরি লিসবন থেকে পাঠিয়েছিল গোয়ায়। গোয়ার গভর্নর আবার বাংলায়

পাঠিয়েছিল। কেন? সেকথা আছে ইতিহাসে Orphan girls sent to India to obtain husbands…

এই দুর্ভাগিনীর দলে শুধু পর্তুগীজ নয়, স্প্যানিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অনাথিনীরাও ছিল। এদের পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—পর্তুগীজ সাহেবদের নেটিভ মেয়ে বিয়ে করার যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তা বন্ধ করা…

এতগুলো তরুণী মেয়ের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে গেল অ্যাণ্ড্রেড। এখানে সাদা চামড়ার লোক আর কয়টা? আর জারজ মেয়েকে বিয়ে করবে কে? তার সঙ্গে ফুর্তি করে রাত কাটানো যায়। কিন্তু ম্যারেজ—ও—নো ইম্পসিবিল! বলল ডায়মণ্ডহারবার কুঠির পর্তুগীজ অফিসাররা।

বেছে বেছে পর্তুগালের মেয়ে কয়টিকে গোয়ায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিল অ্যাণ্ড্রেড। আর অন্যান্য দেশের মেয়েগুলোকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার কুঠিতে সে আর এক বৃন্দাবন তৈরী করল।

ডোরার চোখে জল। নিরালায় কাঁদে।

মনে মনে অনুভব করে লোকটাকে সে ভালবাসে। নিজেই বিস্মিত হয়। মেয়েরা বুঝি এই রকমই হয়—পুরুষের স্পর্শ পেলে তাদের মনের ভেতরে প্রেমের ফুল ফোটে! সে যাই হোক—অ্যাণ্ড্রেড কিন্তু আর আসে না তার কাছে।

অ্যাণ্ড্রেড ভুলেও একবার তাকায় না তার দিকে। গভর্ণর সাহেব ম্যাঞ্জেস দেশীয় মেয়ে, তার মত ক্রশব্রিডিংকে বিয়ে করার নির্দেশ চেয়েছিলেন। কিন্তু দূর সাগর পারে পর্তুগালের নতুন রাজার নতুন নীতি—না, নেটিভ মেয়েকে বিয়ে করলে নেশান একেবারে ডেটরিয়েট করবে! যাহোক—অ্যাণ্ড্রেডের মনে সে নারী হয়ে প্রেমের সঞ্চার করতে পারেনি তো। কি করবে সে—কি করতে পারে! ওই জারজ অনাথিনী ইউরোপীয় মেয়েগুলোর চেয়ে সে কোন অংশে কম। কিন্তু হাজার হোক—ইউরোপীয়ান তো—

কি করবে—সে মরবে—আত্মঘাতী হবে! কিন্তু, না মৃত্যু যে মনের কোথাও বাসা বাঁধেনি!

এই রকম যখন ডোরার মনের অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন শেষরাতে তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল—টক-টক-টক—

কে?

আমি অ্যাণ্ড্রেু-প্লীজ দরজা খোলো ডার্লিং—

বুকের ভেতরটা দুলে উঠল ডোরার। কিন্তু ভেতর থেকেই বলল—তোমার দেশের মেয়েগুলো থাকতে আমার কাছে কেন?

তুমি দরজা খুলবে কি না বলো—তা নাহলে ভেঙ্গে ফেলবো দরজা—কড়া মনে হল অ্যাণ্ড্রেুর গলার স্বর। বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য নৈ···হয়েই দরজা খুলল ডোরা। ভয়ে ভয়ে তাকালো সাহেবের মুখের দিকে। নেশায় ঢুলু ঢুলু দুটো চোখ। সেই দুটো চোখেই দগদগে ঘায়ের মত জ্বলছে তীব্র লালসা।

বলুন—

আমি তোমার সঙ্গে শোবো বলে এসেছি ডোরা—

নো—ইম্পসিবিল, হঠাৎ বাঘিনীর মত হিংস্র গলায় চিৎকার করে উঠল ডোরা—আপনি মেরে ফেললেও—তা আর হবে না— মিথ্যে লোভ দেখিয়ে আপনি আমার সর্বনাশ—

লোভ! হা হা করে হেসে উঠল অ্যাণ্ড্রেু—শব্দ করে দেশালাই জ্বালিয়ে একটা মোটা বার্মিজ চুরুট ধরিয়ে ডোরার বিছানার ওপর আরাম করে বসল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আসলে তুমি তো আমার ওয়াইফ ছাড়া আর কিছু নয়—একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র বাকী—চার্চ, পাদ্রী—বাইবেল—

ওয়াইফ! থর থর করে কেঁপে উঠল ডোরা। বুকের ভেতরে সেতারের সুর বাজতে লাগল। অ্যাণ্ড্রেু তাহলে তাকে ওয়াইফ বলে স্বীকার করে।

সেই দিনই ডোরার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল। ডোরাকে সে বিয়ে করবে কিন্তু অদ্ভুত একটা সর্ত্তে! যে কোন সর্ত্তে রাজী ডোরা—তার স্বপ্নের রাজপুত্র তার অন্ধকার জীবনে আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মা-র মত তারও খাস লিসবনের ছেলে হবে তার স্বামী—

চিত্রা খুশি।

আর একজন দূরে দূরে ফোঁসে। ভেতরে ভেতরে গজরায়। বেশ বুঝতে পারে, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘটে যাবে সাংঘাতিক একটা দুর্ঘটনা—

সেই দিনই রাত্রে ঘটে গেল ব্যাপারটা। সন্ধে থেকেই আকাশের মুখ ভার। টিপ টিপ বৃষ্টি ঝরছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় জল বাড়ল।

চলো যাবে না? অ্যাণ্ড্রেু এসে দাঁড়ালো—

কোথায় যাবে ডার্লিং-এই দুর্যোগে—

বা! চার্চে, হেডবিশপের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তো করা আছে—

তাই নাকি! বর্ষার কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ডোরা।

ওরা দুর্যোগ মাথায় করে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল ভাবী দম্পতি। কিন্তু ওরা জানল না—

দুই দিক থেকে দুটো ছায়ামূর্তি—নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

কড়-কড়-কড়াৎ-দূরে কোথায় বাজ পড়ে। বিদ্যুতের উগ্র সাদা আলোয় ঝলসে ওঠে চারিদিক। সেই আলোয় ডোরা দেখল, চার্চ নয়, জেটির দিকে যাচ্ছে তারা—শুধু তাই নয় আরও লক্ষ্য করল, যমদূতের মত ভয়ঙ্কর চেহারার দুটো লোক অ্যাণ্ড্রেুর সঙ্গে যাচ্ছে। তাদের হাতে লোহার রড—

একি—তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ডার্লিং—

ওরা কারা?

ডোণ্ট বী নার্ভাস ডোরা, বলেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করল অ্যাণ্ড্রেু, বলল, তোমাকে যে একটা কণ্ডিশানের কথা বলেছিলাম মনে আছে!

ও-আমাকে হাঞ্চব্যাক হতে হবে—কিন্তু কুঁজো কি করে করবে?

এই জন্যেই আমার দুইজন মুর স্লেভ সঙ্গে নিয়েছি—ওরা জানে হাঞ্চব্যাক করার টেকনিক—একটু থেমে বলল, আমি যে দেখেছি ডোরা, মালাবার কোস্টের ক্যালে বন্দরে, দুটো হাঞ্চব্যাক মেয়ে মুর রাজাকে পাখার বাতাস করছে, ও-হাউ বিউটিফুল! ডোরা তোমাকে কুঁজো করে আমি—

কিন্তু ওরা কি করে কুঁজো করবে?

—তোমার পিঠে লোহার রড মেরে—

ও—নো—নো—মরে যাবো—মরে যাবো—ছুটে পালাতে গেল ডোরা। —ঠিক এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল র‍্যাবোলো। হাতে খাঁটি মিলানের তৈরী বন্দুক। সে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল অ্যাণ্ড্রেুর ওপরে। এসে পড়ল চিত্রা—তার সঙ্গে এল তার বিশ্বস্ত দশ বারোজন পর্তুগীজ সৈন্য। অ্যাণ্ড্রেুকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসেছে র‍্যাবোলো —সেই রোগা হাড় জিরজিরে মানুষটার দেহে এখন যেন মত্ত অসুরের জোর। বহু বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম ধরে ডোরাকে সে যে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছে সেই প্রেম তার হাড়ে হাড়ে প্রচণ্ড শক্তির প্রলেপ লাগিয়েছে—চিৎকার করে বলল সে,

ডোরা—শয়তানটা তোমাকে রড দিয়ে মেরে কুঁজো করে মুরদের কাছে বিক্রি করার মতলব করছিল—বলেই মত্ত আক্রোশে অ্যাণ্ড্রেডের গলাটা টিপে ধরল। ডোরা ছুটে যেয়ে চিত্রার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

সেই রাত্রেই চিত্রা, ডোরা আর র‍্যাবোলো গোয়ায় রওনা হয়েছিল। গভর্নরকে সব বৃত্তান্ত বলেছিল। শাস্তিস্বরূপ ফোর্সড রিটায়ারমেণ্ট করিয়ে অ্যাণ্ড্রেডকে লিসবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

॥ নয় ॥

ডোরা পার্টান আর র‍্যাবলো।

চিত্রা গভর্নর কোরেস ভিজকণ্ডের কাছে তাদের বিয়ের অনুমতি চেয়েছিল। ডোরা পুরোপুরি নেটিভ মেয়ে নয়। ক্রশ ব্রীড! তাই কোরেস তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করল। র‍্যাবলো সস্ত্রীক ফিরে এল ডায়মণ্ডহারবার কুঠিতে। কিছুদিন পর চিত্রা মারা গেল। তারপর প্রায় ত্রিশ বছর ডোরা ও র‍্যাবোলো সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করেছিল! তাদের একটি মেয়ে হয়েছিল। তার নাম 'আনাম।'

ওদিকে ইতিহাসের খুব দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছিল। ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। সার্থক এই গণঅভ্যুত্থানকে ইউরোপের রাজতন্ত্র শাসিত দেশগুলো যেমন ইংল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন মোটেই সুনজরে দেখেনি। তাই ফরাসী বিপ্লবের পর ভারতের ইংরেজ আর পর্তুগীজরা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। আর শত্রু হয়ে গেল ফরাসীরা! আর ভারতেও মোগল শক্তি তখন অস্তমিত! মারাঠীরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা পর্তুগীজ কুঠিগুলোর ওপর হানা দিয়ে লুঠতরাজ করতে লাগল। এই ধরণের একটা সংঘর্ষে র‍্যাবলো নিহত হলো। ডোরা র‍্যাবলো তার উদ্ভিন যৌবনা মেয়ে আনামের হাত ধরে এসে উঠল ডায়মণ্ডহারবারের ইংরেজ কুঠিতে। এই কুঠির ইনচার্জ তখন উইলিং বি সাহেব। তিনি মানবতাবাদী ঋষিতুল্য মানুষ। দাস ব্যবসার ঘৃণ্য প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য যে কয়জন বিদেশী চেষ্টা করেছিল তার ভেতরে জন উইলিংবি একজন।

উইলিংবি গোয়ায় ডোরা আর আনামের বৃত্তান্ত জানিয়ে চিঠি দিল। কোন উত্তর এল না। ডোরাও মেয়েকে নিয়ে গোয়ায় যেতে রাজি হলো না। কিছুদিন পর ডোরা মারা গেল।

তিন বছর পর।

ডায়মণ্ডহারবার কুঠির বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে আছে উইলংবি। দূরে বিশাল গঙ্গার গৈরিক জলরাশির দিকে তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ।

আনাম—

যাই স্যার, আমি আপনার কফি করছি, ভেতর থেকে আনাম সাড়া দিল। একটু পরে এককাপ ধূমায়িত কফি হাতে নিয়ে বাইরে এল আনাম।

দুধ বেশী দিয়েছি, কফি কম দিয়েছি স্যার, ঠিক যেমন বলেছেন।

কোন কথা বলল না উইলিংবি। আনামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘাড়ের ওপর দুলছে ববচুল। সুগোল মুখে হাল্কা পাউডারের প্রলেপ। পরনে আটোসাটো নীলাভ রঙের স্কার্ট। গায়ের গোলাপী রঙে নীলাভ সেই স্কার্ট যেন তরল জ্যোৎস্নার মত আশ্চর্য কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলেছে। তারদিকে তাকিয়ে ডোরার কথা মনে পড়ে গেল। ডোরা বলেছিল, মেয়েকে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম। দেখবেন—আর যাই হোক—যেন কেউ ওকে স্লেভ করে না রাখে—আমার বড় আদরের মেয়ে, বলতে বলতে মুমূর্ষু ডোরার চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল!

ডোরাকে যে কথা দিয়েছিল তা সে রেখেছে—আনামকে খুব যত্ন করে নিজের কাছেই রেখেছে। কিন্তু ফুলের লোভে যেমন ভোমরা আসে তেমনি দু একজন কুঠির আনাচে কানাচে উঁকি দিচ্ছিল। তাকে জড়িয়ে আনাম সম্বন্ধে মুখরোচক আলোচনাও যে চলছিল না—তা নয়—কিন্তু—সেসব উপেক্ষা করে আনামকে সসম্মানে এবং সতর্ক প্রহরায় রেখেছে। অবসর সময় তাকে দেশবিদেশের ইতিহাস এবং সাহিত্যও শোনায়।

স্যার, আপনি একবার স্কুলের দিকে যাবেন বলেছিলেন, জোসেফ এল। শক্ত সমর্থ চেহারা।

জোসেফকে দেখেই আনামের চোখে হাসির আভা ঝিকমিক করে উঠল। জোসেফ মাথা নীচু করল। লজ্জার ছায়া পড়ল তার চোখে।

জোসেফ নেটিভ খৃস্টানের ছেলে। উইলিংবি নেটিভদের জন্য একটী স্কুল করেছিল। জোসেফ সেই স্কুলের মাষ্টার। জোসেফকে দীক্ষা দিয়েছেন,

লেখাপড়া শিখিয়েছেন তিনি। খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনিই স্কুল খুলেছেন।

তোমার স্কুলে মোট কতজন ছাত্র হয়েছে?

দশজন ছাত্র স্যার, আর তিনজন ছাত্রী—

বাঃ বাঃ বেড়েছে হে? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল উইলিংবি—বাড়বে—বাড়বে আরও বাড়বে হে—

একটু চা খাবেন মাষ্টারমশায়? আনাম ভদ্রতা করল।

খট্—খট্—খট্—খট্—দূরে রাস্তায় দ্রুত ধাবমান অশ্বখুরের শব্দ শোনা গেল। ভয়ের ছায়া পড়ল আনামের চোখে। দৌড়ে ভেতরে পালিয়ে গেল সে।

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে লাফিয়ে নামল মিঃ ক্রীকল। দৈত্যের মত বিশাল চেহারা। দুদিকে বিশাল জুলফী। লাল লাল দুটো চোখে সন্ধানী দৃষ্টি ফুটিয়ে উইলিংবির কুঠির আশে পাশে কাউকে যেন খুঁজতে লাগল।

হ্যালো—হঠাৎ কি মনে করে ক্রীকল্? উইলিংবি বেশ কষ্ট করে অতিথি আপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

তুমি কি ভেবেছো? কোন ভূমিকা না করেই বলল ক্রীকল। সে নীলের ব্যবসা করে চুটিয়ে। কাউকে পরোয়া করে না। দেশী নেটিভদের চাবুক মেরে কাজ আদায় করে। ক্রীকলের নাম করলে আশপাশের চল্লিশ মাইলের ভেতরে বাচ্চারা ভয়ে ঘুমোয় না।

কি, কথা বলছো না কেন? চিৎকার করে উঠল ক্রীকল!

কিছুই বলার নেই বলেছি না ক্রীকল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল—আমার ওই এক কথা—

আচ্ছা শোন, পুরো একশো টাকা দেব—

একশো কেন, হাজার টাকা কি লক্ষ টাকা, এমন কি সারা পৃথিবীর বিনিময়েই আমি তোমার কাছে আনামকে বিক্রি করবো না।

হো হো করে হেসে উঠল ক্রীকল। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল—কেন রাত্রে বুঝি একা থাকতে কষ্ট হয় সন্ন্যাসী মহাপুরুষ।

সাট আপ স্কাউণ্ড্রেল। এখুনি তোমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দেবো—বাঘের মত গর্জে উঠল শান্তশিষ্ট উইলিংবি। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঝরছে।

আমি কোম্পানীর ডাইরেক্টরিসদের জানাবো, তুমি একটা নেটিভ মেয়েকে নিয়ে রাত কাটাচ্ছ, বলতে বলতে পিছু হটতে লাগল, ক্রীকল। ঘোড়ায় চেপে চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে বলল—আই উইল সি—তুমি আনামকে কতদিন কাছে রাখতে পারো—

ক্রীকল চলে যাওয়ার পরেই কুঠির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আনাম। ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখ। ভীরু হরিণীর মত থরথর করে কাঁপছে। ও উইলংবিকে একটা অদ্ভুত কথা বলে বলল, স্যার আমার জন্য আপনি এতবড় বিপদের ঝুঁকি নেবেন? আপনি আমাকে ওই সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিন—

উইলংবি খুব বিস্মিত হয়ে সেই দুর্ভাগিনী আনামের দিকে তাকালো। ক্রশত্রীড হয়ে জন্মেছে। হীনমন্যতায় একেবারে ছেয়ে গিয়েছে ওর মন। বলল—তুমি তোমার কাজে যাও—

ডেস্ক চেয়ারে বসে ভাবতে শুরু করল উইলংবি। কি করবেন, কোম্পানীর ওপরওয়ালাদের জানাবেন। কিন্তু তারাও তো সন্তুষ্ট নয় তার ব্যপারে। নেটিভদের সঙ্গে মাখামাখি তারা ভাল চোখে দেখে না। হঠাৎ বজ্রাৎ চমকের মত একটা ফন্দী এসে গেল মাথায়।

দিন কাটে। ভয়ে ভয়ে এক একটি রাত্রিও পার হয়ে যায়। ডায়মণ্ড ...বার কুঠিতে গার্ডের সংখ্যা বাড়ালো উইলংবি। তার অবৈতনিক স্কুলের ...রা, মাষ্টাররা সব দল বেঁধে রাত্রে কুঠিতে থাকে। উইলংবি প্রত্যেকের ...তে একটা করে বন্দুক দিয়েছে।

একদিন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রে ডায়মণ্ডহারবারের উইলংব ...হেবের সেই কুঠিটাকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল মশালধারী ...্যর দল। সঙ্গে সঙ্গে কুঠির ভেতর থেকে গর্জে উঠল বন্দুক। ...ই নিশি রাত্রে একটা নেটিভ মেয়েকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল ...যুদ্ধ।

উইলিংবি এখও ভাল চাও তো আনামকে দিয়ে দাও—পিস্তল নিয়ে ...বারে তার মুখোমুখি এসে পড়ল ক্রীকল। উইলিংবিও পিস্তল উঁচিয়ে ...ল। সঙ্গে সঙ্গে উইলিংবির দলের লোকেরা ক্রীকলকে ঘিরে ফেলল। ...দের সরে যেতে ইঙ্গিত করল উইলিংবি।

নেটিভ একটা মেয়ের জন্য তুমি কী কাণ্ড করছো বলো তো—তুমি ইংরেজ,

আমি ইংরেজ—একটু থেমে বলল উইলিংবি, তুমি তো টাকা দিয়ে অন্য (
কোন স্লেভ মেয়েও কিনতে পারো—

কেন তোমার আনামও তো মেড স্লেভ !

না, সে রীতিমত ডোরা র‍্যাবোলোর মেয়ে—

রাখো—বর্ণশঙ্কর একটা মেয়ে—সে স্লেভ ছাড়া কি—

ওসব কথা ছাড়ো—বলো আনাম কোথায়—

আমি জানি না—

মানে ? আহত জন্তুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ক্রীকল। সঙ্গে সঙ্গে উইলংবি
অনুচরদের বন্দুকের নলগুলো নিশ্চিত মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে আরও এগিয়ে এ
ক্রীকলের বুকের কাছে।

হো হো করে হেসে উঠল উইলংবি। টেনে টেনে বলল—পাখী পালিয়েছে
পালিয়েছে !

একেবারে যেন চুপসে গেল ক্রীকল। দাঁতে দাঁত ঘসে বলল—শয়তা
তুমি কোথাও নিশ্চয়ই তাকে লুকিয়ে রেখেছো !

তুমি ইচ্ছে করলে বাড়ী সার্চ করতে পারো—আমার একটা লোক
তোমাকে বাধা দেব না—

বাড়ীর আনাচে কানাচে তক্তপোষের নীচে, আলমারীর পাশে তন্ন ত
করে খুঁজে দেখল ক্রীকল। কোথাও আনামকে পেল না। ব্যর্থ হয়ে যাওয়া
সময় আবার শাসিয়ে গেল উইলিংবিকে।

আবার শাস্তি নেমে এল কুঠিবাড়ীর চারিদিকে।

ছাত্র শিক্ষক আর অন্যান্য অনুচরদের বিদায় দিল উইলংবি। একেবা
নির্জন বাড়ীতে ভূতের মত একা বসে রইল সে। আর দূরে দিগন্তবিসা
মাঠের নিবিড় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে প্রশা
নেমে এল ক্রীকল এবং তার মত আরও অনেকে কেন যে এই দেশটা
ভালবাসতে পারে না—কেন পারে না—মানুষগুলোকে ভালবাসতে ? কী
আর অবারিত এদের জীবন—কত নিরীহ। নিজের কৃতিত্বে নিজে বি
হয়ে গেল। আর কখনো ক্রীকলের মত কেউ আনামকে কিনতে পারবে
—পারবে না তাকে 'স্লেভ' করে রাখতে। হীন দাসত্বের মর্মান্তিক জীব
অভিশাপ থেকে তাকে চিরকালের মত মুক্ত করে দিয়েছে···

ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে অনেক—অনেকদূরে কাকদ্বীপের রাস্তার ধা

জঙ্গলের ভেতরে এক গ্রামে যদি কখনও যেতে পারো, তাহলে দেখতে পাবে একটা জীর্ণ সমাধি স্তম্ভ ! লেখা আছে : Here once lived Anam…আর বাদবাকী কথাগুলো শত শত বছরের বর্ষার জলে, সূর্যের রোদে ধুয়ে মুছে গিয়েছে—

কোন গ্রাম—ওখানে গেল কি করে ?

গোলমালের আশঙ্কা আছে ভেবে উইলিংবি একদিন রাত্রির অন্ধকারে সেই স্কুলমাষ্টার জোসেফ এবং আনামকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল একেবারে জোসেফের স্বগ্রামে। ওদের দুজনের পরস্পরের আসক্তির কথা জানতো উইলিংবি। যাওয়ার সময় শুধু বলেছিল—তোমরা সুখী হও—তোমাদের মিলিত জীবন প্রমাণ করবে, অন্তত একজন ইংরেজ দাসব্যবসাকে ঘৃণা করেছে—ভুলে যেও না—তোমরা—কারো দাসদাসী—তোমরা—মুক্ত, স্বাধীন আর পাঁচটা মানুষের মত—

সেই গ্রামের জীর্ণ সমাধিস্তম্ভটি দিগন্তবিস্তারিত মরুর ভেতরে একটি সবুজ চারাগাছের মত ওদের হাস্যোজ্জ্বল সুখী জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে বহু শতাব্দীর ওপার থেকে ঘোষণা করছে—উইলিংবির মহত্বকে, তার উদারতাকে।

॥ দশ ॥

…আমার মা আনামের মুখে শুনেছি, দিদিমা আর তার মা চিত্রা পার্টানের আরও কত টুকরো টুকরো কাহিনী…সব মনেও পড়ে না ছাই– লরা লিখেছিল তার ডায়েরীতে।

আনাম ও জোসেফের জীবনও কিন্তু মোটেই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। জোসেফের নিজের গ্রাম করঙ্গুলি থেকে তারা কুঠিবাড়ীতে ফিরে এসেছিল। ফিরে এসেছিল উইলিংবির নির্দেশে। কিন্তু গোয়া থেকে সরকারী আদেশ এল, জোসেফ মিঃ উইলিংবির স্লেভ ছাড়া আর কিছু নয় এবং সে নেটিভ খ্রীষ্টান। কাজেই সে আমাদের সরকারী বাংলোতে কিছুতেই থাকতে পারে না—

কি হবে—কোথায় যাবো মাই লর্ড, উইলিংবির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল আনাম।

ছোট কাল থেকে মানুষ করেছেন। উইলিংবির বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কিন্তু এদের কোথায় রাখবে—কি করবে! তার কাছে রাখলে কুঠির কর্মচারীরা ওদের সঙ্গে দাসদাসীর মত ব্যবহার করবে—

কি ভাবছেন স্যার! ভয়ে ভয়ে বলল জোসেফ।

তোমরা তৈরী হয়ে থেকো, গম্ভীর হয়ে বলল উইলিংবি কাল খুব ভোরে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে—

ওরা চলে গেল।

এখানে তার থাকা হবে না। সে তো আর তার মা-র মত কোন সাদা চামড়ার লোককে বিয়ে করতে পারেনি! চোখ ফেটে জল এসে পড়ল আনামের—

রাত বাড়ে! নির্জন ঘরে পায়চারি করে উইলিংবি। কারো স্লেভ নয়, কারো ব্যক্তিগত চাকর নয়—মানুষের জন্মগত অধিকার যে স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতা নিয়ে ওদের মাথা উঁচু করে বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুনিয়ার দেশে দেশে এই জঘন্য প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছে মানুষ। এদেশেও নেটিভদের কাগজ 'সমাচার দর্পণে' জোরালো সম্পাদকীয় লিখেছে দাস প্রথার বিরুদ্ধে। সুপ্রীম কোর্টের জজ উইলিয়ম জোনস পার্কে পার্কে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। আরও অনেকে চেষ্টা করছে। কিন্তু যুগযুগান্তর ধরে যারা ভ্যাম্পায়ারের মত মানুষের রক্ত চুষে চুষে খেয়ে স্ফীত হয়েছে, তারা? তারা জীবন্ত পণ্যের এমন লাভের ব্যবসা ছাড়বে কেন? কি করবে? —যাবে একবার জোনসের কাছে। তীব্র অস্বস্তিতে জ্বলে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরটা।

শেষ রাতের অন্ধকারে তারা বেড়িয়ে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল নিঃশব্দে। তারা তিনজন।

উইলিংবি সাহেবের ঘোড়ার গাড়ি চলল কাকদ্বীপের রাস্তা ধরে। ইংরেজ কুঠির একজনও জানতে পারল না, রাত্রি শেষের অন্ধকারে কোথায় চলেছে বড় সাহেব। জানতে পারল না জোসেফ আর আনামও।

খট্-খট্-খট্-ঘোড়ার খুরে খুরে শব্দ হচ্ছে। নিথর স্তব্ধতা শিউরে শিউরে উঠছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার? আনাম বলল ভয়ে ভয়ে।

কোন কথা বলল না উইলিংবি। অদ্ভুত একটা পরিতৃপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে

উঠেছে তার মুখ। তারা পার হয়ে গেল কয়া, পার হয়ে গেল নাইযা, পার হয়ে গেল কবগুলি। গাড়ি এসে দাঁড়াল নিশ্চিন্তপুরের গীর্জার সামনে।

হেডবিশপ রোন্যাল্ড বেরিয়ে এল। মনো হলো তাকে আগে জানানো হয়েছিল।

আসুন—আসুন মিঃ উইলিংবি— আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি—

উইলিংবি তার কথা যেন শুনতে পেল না। চোখদুটো সরু করে দূরে কাকদ্বীপের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। পর্তুগীজ কুঠি কি ইংরেজ কুঠির কেউ অনুসরণ করেনি তো! জানতে পারলে এখানে এসে আনামকে জ্বালাবে। হয়তো জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে গিয়ে স্লেভ করে রাখবে।

কি দেখছেন অমন করে মিঃ উইলিংবি?

তার মনের অস্বস্তির কথা বলল রোনাল্ডকে।

আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না মিঃ উইলিংবি। একটু থেমে বলল রোনাল্ড, ওদের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেব না—

বজবজ কুঠির ক্রীকলের এখনও নজর আছে আনামের ওপরে, একটু থেমে ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করে বলল উইলিংবি, জোসেফের গ্রাম কবগুলিতে যখন ওদের লুকিয়ে রেখেছিলাম, তখন সেখানেও হামলা করেছিল পশুটা—ক্রীকল কেন—আরো অনেকেই স্বাধীনভাবে একটা নেটিভ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছে এটা সহ্য করতেই পারে না—

..."এইখানেই আমার মা আর বাবা বহু বছর ছিলেন, লরা লিখেছিল, রোন্যাল্ডের যত্নে ও আন্তরিকতায় আর যীশুর কৃপায় তাদের কোন কষ্ট হয়নি। কিন্তু এই নিশ্চিন্তপুরেই আমি হতে গিয়ে মা মারা গেলেন—

লরা যখন ভূমিষ্ঠ হলো দক্ষিণবঙ্গের সেই গণ্ডগ্রামে তখন গোয়ার গভর্নর জোসে জ্যাকুইন ডি শাস্তা! তিনি ইণ্ডিয়াতে এসেই দেখলেন, এখানে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন—ভাস্কো থেকে শুরু করে তাদের পূর্বসূরীরা যত অত্যাচার করেছে, সেই যুগসঞ্চিত অবিচার অত্যাচার নিপীড়ন পুঞ্জীভূত আক্রোশ হয়ে জলছে আগুনের মত দেশের মানুষের মনে। সমুদ্রের উপকূলের গ্রামে গ্রামে দস্যুবৃত্তি আর দাস ব্যবসার জন্যই সবাই তাদের ঘৃণা করে। ইংরেজরাও শোষণ করেছে—কিন্তু জঙ্গল কেটেছে, রাস্তা বানিয়েছে, দেশের মানুষের মুখের ভাষা শেখার জন্য ফোর্ট উইলিয়মে স্কুল বসিয়েছে আর তাদের একটা—একটা গঠনমূলক কাজ নেই। দূর অতীতের তিনশো বছরের ইতিহাসের দিকে

তাকালে দেখা যাবে, শুধু খুন জখম,রক্তপাত আর জীবন্ত পণ্যের ঘৃণ্য ব্যবসায় —সে ইতিহাস কলঙ্কিত। তাই জ্যাকুইন-ডি-শাস্তা এসেই ঘোষণা করলেন— ঐতিহাসিক সেই ঘোষণা—Not even a single native and crossbreed will be recognised as slave and the status of slavery shall be abolished throughout all the possession of Portuguese crown অর্থাৎ এদেশীয় কোন লোক এবং বর্ণশঙ্কর কাউকে দাস হিসেবে বিবেচনা করা চলবেনা। ভারতে পর্তুগীজ অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চল থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হবে...

এই ঘোষণার কথা জানতে পেরে লরা আর জোসেফকে উইলিংবি গোয়ায় জ্যাকুইন ডি সাস্তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর একটা চিঠিতে লরার মা, দিদিমার পরিচয় ও তাদের পূর্ব-ইতিহাস জানিয়ে শেষে মন্তব্য করেছিল, যে ঘৃণিত ও মানবতাবিরোধী দাস ব্যবসার জন্য ইণ্ডিয়াতে আপনাদের বিপর্যয়ের অন্ত নেই, সেই দাসপ্রথা লুপ্ত করার সিদ্ধান্তটা অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে।

তারপরে লরা নিজের সম্বন্ধে আর কিছু লেখেনি। কেমন করে কত বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে তার জীবন কেটেছিল। কবে পেড্রোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—এসব ব্যাপারে আর একটি অক্ষরও লেখেনি।

এই পর্যন্ত লিখে থামল বৃদ্ধ অধ্যাপক আলবুকের্কাথ!

শেষে উপসংহারে লিখল—নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে লরার সেই দুই বছরের মেয়ে মার্থা এসে পড়েছিল আমার কাছে। তারপরে তেইশ বছর ধরে মার্থাকে একটু একটু করে বড় করেছি আর মনের কোণে কোণে সযত্নে লালিত করেছি একটা বাসনা, দাসদাসীদের জীবনকাহিনী লিখবো। আনাম, ডোরা —আর কীর্তনখালির দীনু আচার্যের মেয়ে হবে আমার প্রেরণা—

এসব সে কি লিখছে? থমকে থেমে গেল আলবুথেরুথি। দাসব্যবসার ইতিহাস লিখতে গিয়ে নিজের কথা ফেঁদে বসেছে। পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে তাকালো সে। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল তার চোখে। তার মনে হলো, এ পর্যন্ত সে কিছুই লেখেনি, বেনিয়াটোলার স্লেভ গোডাউনের পঞ্চাশ টাকা দামের স্লেভগার্ল দালিয়া, কি সেই পুরানের মঙ্গলা দাসী আর জাভারবেগের জাহাজের সেই দুর্ভাগিনী পুষ্পবেণীর টুকরো টুকরো করুণ ইতিবৃত্ত তার বইয়ের উপাদান

হতে পারে—খুব ভাল উপাদান হতে পারে চিত্রা পাটান থেকে শুরু করে আনামের কাহিনী। কিন্তু এদের কথা লিখলে তো দাস ব্যবসার ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না! হতে পারে না। যে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে দীর্ঘ পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ছয় দশক পর্যন্ত সেই সুদীর্ঘ চারশো বছরের ইতিহাস কেমন করে—কেমন করে লিখবে? শুধু কি আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলেই দাসব্যবসা চলেছিল? তা নয়—

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ একটা মানুষের ছাব। আগুনের মত গায়ের রঙ। এক মুখ লালচে দাড়ি। পরনে গেরুয়া রাঙা। আলখাল্লা। মনে হয় কোন মুসলমান ফকির কি দরবেশ। কিন্তু তা না—আকানাসি নিকিতিন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর রাশিয়ান পরিব্রাজক। দরবেশের ছদ্মবেশে এসেছিল ভারত পরিক্রমায়। তিনিও দেখেছেন কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে হটুগি আর বুলজার বন্দরের বাজারে মানুষ কেনাবেচা চলছে। জীবন্ত এই পণ্যের ব্যবসা চলছে ডারবেণ্টে, ত্রেবিজন্দে। নিকিতিন দেখেছে, 'স্লেভে'র কারবারী ভারতীয় বণিকরা ঘুরছে তাদের পণ্য নিয়ে তাব্রিজের বাজারে।

মধ্যএশিয়ার রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরের ওপর দিয়ে চলেছে উটের দীর্ঘ ক্যারাভান। ভারতীয় স্লেভ মার্চেণ্টরা তাদের পসরা নিয়ে যাচ্ছে বুলজার বন্দরে। উটের গলায় ঘণ্টা বাজছে ডিং-ডং-ডং। হু হু বাতাসে সেই ঘণ্টার শব্দ, হতভাগাদের করুণ কান্নার আওয়াজ চারিদিকের নিথর স্তব্ধতাকে শিউরে শিউরে দিচ্ছে।

নিকিতিনের ভ্রমণবৃত্তান্তে আছে ভারতীয় বণিকরা যেসব স্লেভ ডারবেণ্টে, তাব্রিজে বিক্রি করতো—সেখান থেকে হতভাগাদের আবার ইরাণে, সিরিয়ায় স্পেনে রপ্তানী করা হতো! আজও শত শত শতাব্দীর এই গভীর কলঙ্কের চিহ্ন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাস্পিয়ান সমুদ্রের ধারে 'জেনোয়িজ কলোনীর ধ্বংসচূর্ণ!—এখানেই ইণ্ডিয়ান স্লেভ মার্চেণ্টরা তাঁবু ফেলে ডেরা করতো—

শুধু কি আফানিসি নিকিতিন?

বার্নিয়ার দেখেছে, মধ্যপ্রদেশের সোনার খনিতে কাজ করছে স্লেভরা। বারোবারাসও বলছে, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দাসদাসী চালান হয়ে যেত সুদূর করোমণ্ডল উপকূলে! কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীর থেকে মধ্যএশিয়ার পাহাড় মরুভূমি পেরিয়ে একেবারে কুমারিকা আর ওদিকে কাথিওয়াড় থেকে

কক্স বাজার পর্যন্ত এই যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে ব্যবসা বিস্তৃত ছিল তার পুরো ইতিহাস সে কি করে লিখবে? কি করে লিখবে প্রতিটি শতাব্দীর ইতিহাস। এত উপাদান কোথায় পাবে? আর পেলেই বা কি—লিখতে বসলেই মনে পড়ে যায় লরার শুকনো মুখখানা। ওর ফাটা ফাটা মুখের রেখায় রেখায় লেখা শত শতাব্দীর ইতিহাস! মনে পড়ে তার ডায়েরীতে লেখা মা-দিদিমার মুখে মুখে শোনা তাদের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত—আর তার কানের কাছে যেন কোটি কোটি দাসদাসীর বুকফাটা কান্না হাহাকারের মত বাজতে থাকে। চেতনা বিকল হয়ে আসে! লিখবে কি।

লরা জানে না। কালো মেঘের ভেতরে বিদ্যুতের চমকের মত স্লেভদের প্রতি উদারতার নজীরও আছে। সুদূর অতীতে তৈমুরলঙ্গ যুদ্ধ জয়ী হয়েই যেতেন বন্দী শিবিরে। খুঁজে খুঁজে দেখতেন, যুদ্ধবন্দীদের ভেতরে কারা শিল্পী কারিগর। তাদের সসম্মানে মুক্তি দিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসতেন। তার নতুন রাজধানী সমরখন্দের রূপকার হলো কতগুলো দাসদাসী।

আরও আছে—

সব যুগে সব দেশে। কিন্তু তাদের ওপরে তীব্র অত্যাচার রক্তপাত খুন জখমের গভীর, কলঙ্কের ভেতরে সেসব ডুবে গেছে। তা নাহলে উনিশ বছরের তরুণী মেয়ে কুসুমকে যখন তার মালিক জমিদার ঝুলিয়ে বেত মেরেছে —তার কিছুদিন পরেই দেখা যাচ্ছে—

কলকাতার ওল্ডচার্চ মিশন সোসাইটির বাড়িতে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতার স্ত্রী মিসেস কিয়েরন্যানডা মারা যাচ্ছে।

সাদা ধবধবে বিছানায় যেন একটা কঙ্কাল অবলীন হয়ে আছে। চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে আত্মীয়স্বজন এবং শহরের দু'একজন অভিজাত ইংরেজ। তাদের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া থমথম করছে।

কিছু বলছেন?

একজন ঝুঁকে পড়ল তার বুকের ওপর। মিসেস কিয়েরন্যানডার বেগুনী রঙের আমসির মত ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। কিছু বলার চেষ্টা করছে বোধ হয়। মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা!

ওদের কাছে ডাকো—বলেই তার খাটের নীচে ইঙ্গিত করলেন। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখল, তার দুটো স্লেভ তক্তাপোষের পায়া ধরে কাঁদছে।

সে কান্নার কোন শব্দ নেই! অভিজাত ইংরেজদের চোখে ঘৃণা ফুটে উঠল। তবুও—

যার ওপারের ডাক এসেছে তার শেষ ইচ্ছা। তাই ওদের নিয়ে আসা হলো তার কাছে।

বল তোরা কি চাস?

ওরা কোন কথা বলল না। কিম্বা হয়তো বুঝতেও পারল না, কি চাইলে ভাল হয়। তাই নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল—

আমার টাকা—বাড়ি ঘর—মৃত্যুপথযাত্রীর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে জড়িয়ে আসে—

আপনি বলে যান, আমাদের যে কিনবে, সে যেন যন্ত্রণা না দেয়, বিনা কারণে যেন না মারে—

আমি কথা দিচ্ছি, তোদের কখনো কেউ কিনতে পারবে না—বলেই তার বিছানার তোষকের নীচে দেখিয়ে দিল। ওরা সেখান থেকে একটা লম্বা খাম বের করে মিসেস কিয়েরন্যানডার হাতে দিল। কাঁপা কাঁপা হাতে সেই খাম ছিঁড়ে বের করল একটা দলিল! ওপরে ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্প আঁটা। সেই দলিলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোনসের কাছে আবেদন করা হয়েছে—দাসত্ব থেকে তার দুটো দাসকে মুক্তি দেওয়া হোক। নীচে কিয়েরন্যানডা সত্যপাঠ লিখেছে আমার এই বক্তব্য আমার জ্ঞান মতে সত্য এবং আমার কোন ওয়ারিশ ওদের ওপর কোন অধিকার দাবী করবে না ...এই দলিলের নীচে সুপ্রীম কোর্টের সিল আছে—নীচে আছে উইলিয়ম জোনসের স্বাক্ষর। তার পাশে আছে লাল কালি দিয়ে লেখা চীফজাষ্টিসের নোট,—Approved. Thanks I am assured, which, though not all Judicially taken, has the strongest hold on my belief that Mrs. Kiernander acted in this regard as a true christian and this noble example will, surely enhance the abolition of this trade, the greatest social menace of this century—কিয়েরন্যাণ্ডারের এই উদারতার প্রশংসা করে আরো অনেক কথাই লিখেছিল দাসপ্রথা বিলুপ্তি আন্দোলনের অন্যতম নায়ক স্যার উইলিয়ম জোনস! কিন্তু—

এসব তো ১৮৭৫ সালের কথা। কিন্তু তার আগে? তার আগে

পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ছড়ানো সুদীর্ঘ তিন ৮তিনটি শতাব্দীর দাসব্যবসার সেই ঘটনা-জটিল ইতিহাস? না—

সেই ইতিহাস—বড় মর্মান্তিক আর নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার অবিচারের সেই ইতিহাস সে লিখতে পারবেনা—

কিছুতেই না।

সমাপ্ত